শৈলী

আড্ডা হোক
শুদ্ধতায়

কুটুমবাড়ি
০ কি. মি.

ঈদ সংখ্যা

শৈলী

আগস্ট ২০১১

উৎসর্গ

তারেক মাসুদ এবং মুশিক মুনীর সহ সড়ক দুর্ঘটনায় সকল নিহতদের.......

তোমার স্নেহের কোলে
আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত মুখে
ফুটিবে স্নেহের হাসি
দেখিবারে আশা হে.......
মরনের তরে

http://shoily.com

ঈদে সকল শৈলার এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল শৈলীর ঈদ শুভেচ্ছা.........

শৈলী

কুটুমবাড়ি, ঈদসংখ্যা
শৈলী.কম -এর প্রয়াস,
আগস্ট, ২০১১

মু খ ব ন্ধ

নির্বাহী সম্পাদনা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
রিপন কুমার দে

সহ-সম্পাদনায়
জুলিয়ান সিদ্দিকী

প্রচ্ছদ
শৈলী টিম

তত্ত্বাবধান এবং অলঙ্করণে
শৈলী ই-বুক টিম

কিছু ছবি
অনলাইন থেকে সংগ্রহীত

প্রকাশক
শৈলী প্রকাশনা, শৈলী.কম
©shoily.com

শৈলী বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ শিল্প ও সাহিত্য ব্লগ পোর্টাল। জন্মকালের প্রথম দিন থেকেই শৈলী তার গুণগতমানের জন্য শুভানুধ্যায়ীদের বিপুল প্রশংসা পেয়ে আসছে। আমরা এজন্য সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। অনেক শ্রম, অনেক সাধনার বিনিময়ে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে এই ভুবনটি। এর পিছনে সম্মানিত শৈলারদের মননশীল লিখনি প্রশংসার মূল ভাগীদার। শৈলী কুটুমবাড়ি ঈদসংখ্যার ভুলভ্রান্তিতে ক্ষমাসুন্দর মনোভাব প্রত্যাশা করে শৈলী।

বাঙালি জীবনের সেরা ঋতু হয়তো বর্ষা নয়। কিন্তু তবু বিধ্বংসী দুঃস্বপ্নের পাশাপাশি আনন্দ-উপাচারে তার ডালি যেন উপচে পড়ে। বিশেষত বাংলাদেশের দুটি সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব এই সময়েই উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মমত নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিকে এই ঋতু জড়িয়ে রাখে এক অদ্ভুত মায়াবী বন্ধনে। এই সময় দূরের স্বজনরা ঘরে ফেরে, ভ্রমণ পিপাসুরা বেরিয়ে পড়ে পথে-প্রান্তরে। বাঙালির যা কিছু নিজস্ব, তার মধ্যে ঈদোৎসব এবং শারদোৎসবের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। তার বিশেষত্ব সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই। শুধু এইটুকু অনুভব করতে হবে, যেন নানা সংকট আর অভিঘাত সত্ত্বেও আমাদের জীবন থেকে এই ঋতুর অপারমাধুর্য হারিয়ে না যায়। গ্রীষ্মের অভিঘাত, বর্ষার বিধ্বংসী দুঃস্বপ্ন এবং জীবনের সব হতশ্রী দূর হোক শরতের আগমনী শুদ্ধ স্পর্শে। সবার অর্ন্তলোকে স্পন্দিত হয়ে উঠুক জীবন যাপনের মধুর ছন্দ।

শৈলীর ঈদসংখ্যা এটি । সে হিসেবে এই সংখ্যাটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। একটা বিরাট আকাশের স্বপ্ন দেখি আমরা, দেখি অবারিত সফলতার সুর। পাশাপাশি সকল সম্মানিত শৈলারদের কাছে থাকবে আমাদের অপরিসীম কৃতজ্ঞতা এবং নিগূঢ় শুভেচ্ছা। এই ক্ষীণ পথচলায় আমাদের অর্জন আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসা।

পবিত্র ঈদোৎসব এবং সার্বজনীন শারদোৎসবের মেজাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে নতুন সাহিত্যের স্বাদ। ঈদো-শুভেচ্ছা এবং শারদলক্ষ্মীকে বাঙালি বরণ করে নেয় তার চিরাচরিত রচিত সাহিত্য সম্ভারে। সেই সম্ভার পুস্পার্ঘ্যের মতো নিবেদিত হলো কুটুমবাড়ির পাতায় পাতায়, প্রতিটি কোণে। শুভ এবং মঙ্গলময় পরিভ্রমনের কামনায়। "রচনা পরিভ্রমণ শুভময় হউক"।

ঈদের শুভেচ্ছা !

এক নজরে শৈলী—

প্রতিষ্ঠাকাল: ১ লা নভেম্বর, ২০০৯

শৈলী টিম: রিপন, কাওসার, তারেক, মহিউদ্দিন, দীপ্ত, রনি, দাউদ, মাসুদ, সালেকুর, সুব্রত, মনির, পাবেল, মাহিমা, সোহাগ, রাকেত, তানভীর, লিংকন, নায়েব. সাখাওয়াত, মিতুল, সোহেল, মেঘ, তপন, তুহিন এবং অন্যান্য।

শ্লোগান: আড্ডা হোক শুদ্ধাতায়, শিল্প আর সাহিত্যে

"কু টু ম বা ড়ি
ঈদ সংখ্যা"

•শৈলীর প্রজেক্ট

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর...

–জসীম উদদীন

শৈলীর শ্রদ্ধার্ঘ্য...

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়	কুটুমবাড়ি	/রিপন কুমার দে	১
বিশেষ রচনা	আমার বন্ধু মিশুক	/লুৎফর রহমান রিটন	১১
রোজন-মাচা	সে-বচন	/সেজান মাহমুদ	১৭
কবিতাশৈলী	ক্রিকেটের উল্লাসে কাঁপা	/তুষার গায়েন	২৫
এলোমেলো	বাবা কত বড়	/টোকন ঠাকুর	২৭
সাক্ষাৎকার	মলয় রায়চৌধুরীর সাক্ষাতকার	/শৈবাল	৩১
সনেট	কুটুমবাড়ি	/রাজন্য রুহানি	৩৬
মুভি রিভিউ	তারেক মাসুদের মাটির ময়না	/আলম খোরশেদ	৩৭
কথোপকথন	মিডিয়া মতামত	/শৈলী বাহক	৪২
কথোপকথন	চলচ্চিত্রকার খিজির হায়াৎ খানের সাথে কথোপকথন	/শৈলী বাহক	৪৯
কার্টুন	কাওসারের কার্টুন	/কাওসার মাহমুদ	৫৭
এলোমেলো	সম্বোধনহীন	/সানজিদা শাহরিয়ার	৬০
আড্ডা	শৈলী অনলাইন আড্ডা	/শৈলী বাহক	৬২

সূ চি প ত্র

কবিতাশৈলী	শুধু চাই আমার উপবাসীরে	/চারুমান্নান	৬৫
রন্ধনশৈলী	নাড়ুর বাসনা	/তুষার গায়েন	৬৬
কবিতাশৈলী	বৈশাখী	/নীল নক্ষত্র	৬৭
কবিতাশৈলী	রোদ বিক্রেতা	/শৈবাল	৭০
প্রবন্ধ	বিষাদে বিবর্ন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ	/সকাল রায়	৭১
প্রবন্ধ	কোচিং সেন্টারের বাহুগ্রাসে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা	/বহ্নিশিখা	৭৭
কবিতাশৈলী	তোমার সত্তা পাবে ঈশ্বরের শুদ্ধতা	/সালেহীন ইয়াজুয নির্ভয়	৮২
গল্প	একটি ওয়েটিং রুম এবং কিছু জলছাপ	/রাবেয়া রব্বানী	৮৩
গল্প	জগতে কে কাহার	/জুলিয়ান সিদ্দিকী	৯৯
ছোটগল্প	আজ আমি একা একা	/মামুন ম. আজিজ	১০৮

বিশেষ রচনা

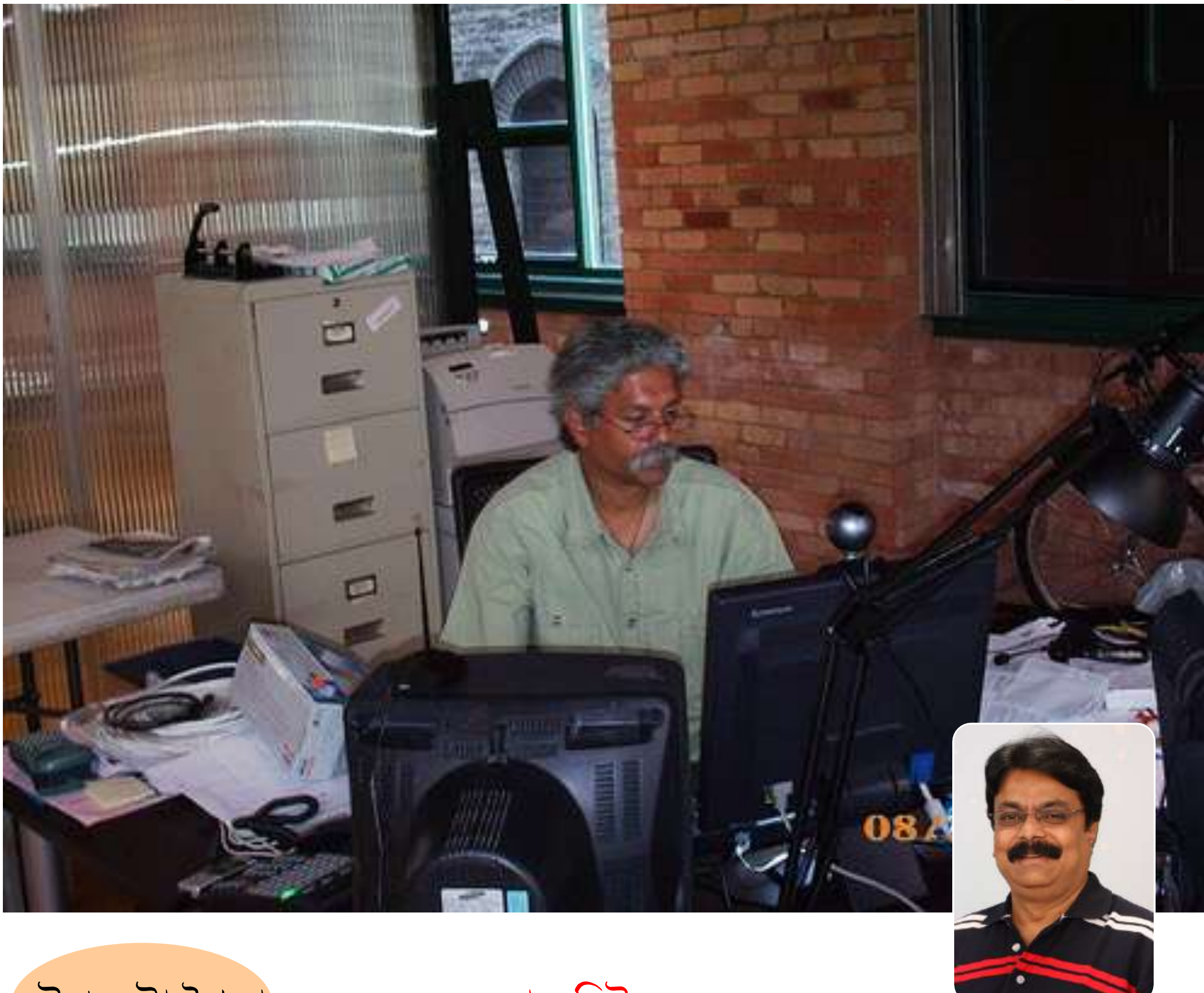

উপদেষ্টা শৈলার লুৎফর রহমান রিটন

আমার বন্ধু মিশুক

“ মিশুকের বাবার হত্যাকারী একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনো হয়নি। সুহৃদের বাবার হত্যাকারীর বিচার কি হবে? ”

বিশেষ রচনা

প্রিয় বন্ধু মিশুক মুনীর নেই! নেই বন্ধু তারেক মাসুদও! সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছে অসামান্য মেধাবী দুজনকেই।

আমার প্রজন্মের এই দুজন মানুষ তাদের মেধা আর যোগ্যতায় চলচ্চিত্র এবং ইলেক্ট্রনিক জার্নালিজমে যুক্ত করেছিল নতুন নতুন মাত্রা। দেশ আর দেশের মানুষকে অনেক দিয়েছে তারা। আরো অনেক দেবার ছিলো তাদের। কিন্তু বাংলাদেশের সড়কপথে ওঁত পেতে থাকা ঘাতক কেড়ে নিয়েছে তাদের দুজনকেই, অকালে।

কানাডায় আমার পাশের শহর টরণ্টোয় থাকতো মিশুক, স্ত্রী মঞ্জুলি আর পুত্র সুহৃদকে নিয়ে। মিশুক আর মঞ্জুলি দুজনই আমার বন্ধু। অটোয়া থেকে আমি টরন্টোয় গেলে প্রতিবারই একটি চমৎকার সন্ধ্যা আমাকে উপহার দিতো মিশুক।

প্রিয় কিছু মানুষকে ডেকে এনে আয়োজন করতো জমজমাট আড্ডার। সেই আড্ডা চলতো রাতভর। আমার জন্যে মিশুক নিজ হাতে রান্না করতো খাসির মাংস। খাসির মাংসের 'নল্লি' আমার প্রিয়, এটা জানতো সে। আহারে কী চমৎকার রান্নাই না করতো মিশুক!

মঞ্জুলিরা একবার একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করলো শিশুকিশোরদের নিয়ে। অতিথি হিসেবে আমাকে নিয়ে গেলো মঞ্জুলি। ওদের সিক্স-সেভেন গ্রেডে পড়া পুত্র সুহৃদ ওর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ভ্রমণের ওপর লেখা ছোট্ট একটা রচনা পাঠ করে শোনালো।

লুৎফর রহমান রিটন

➢লুৎফর রহমান রিটন খ্যাতিমান শিশুসাহিত্যিক। মূলত ছড়াকার হিসেবে তিনি সুপরিচিত।

➢তবে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন এবং গ্রন্থাদি সম্পাদনা করেছেন।

➢

তিনি ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন।

➢পিতার নাম তোফাজ্জল হোসেন এবং মাতার নাম আফিয়া আক্তার।

➢নবাবপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তিনি এসএসসি এবং ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করেন স্নাতক ডিগ্রী।

বিশেষ রচনা

সুহৃদের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে গিয়ে বলেছিলাম মিশুকের বাবা শহীদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর কথা। মুনীর অপটিমা নামে বাংলা টাইপ রাইটার মেশিন ইনোভেট করেছিলেন মুনীর চৌধুরী। সেই মুনীর চৌধুরীর নাতি বাংলাদেশের ওপর লিখেছে রচনা, ইংরেজিতে! আমাদের পরের প্রজন্মেই কি বিশাল পরিবর্তন! আমাদের সন্তানরা কি বাংলা ভুলে যাবে?

"মুনীর অপটিমা নামে বাংলা টাইপ রাইটার মেশিন ইনোভেট করেছিলেন মুনীর চৌধুরী। সেই মুনীর চৌধুরীর নাতি বাংলাদেশের ওপর লিখেছে রচনা, ইংরেজিতে! আমাদের পরের প্রজন্মেই কি বিশাল পরিবর্তন! আমাদের সন্তানরা কি বাংলা ভুলে যাবে?"

আমাকে আশ্বস্ত করেছিলো মিশুক—না। তুমি ভয় পেওনা।

--কিন্তু আমি তো ভয় পাচ্ছি। তোমার সন্তান বাংলায় তো লিখলো না রচনা!
--বাড়িতে ওর সঙ্গে আমরা বাংলাতেই কথা বলি।

--লিখতে পড়তে শেখাবে না?

--শিখবে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না আমাদের পরের প্রজন্ম কমপিট করবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে। ওর শেকড় প্রোথিত থাকবে বাংলাদেশেই কিন্তু সে হবে ইন্টারন্যাশনাল। ওকে আমি সেভাবেই বড় করছি,বড় হতে দিচ্ছি।

আসলেই। পুত্র সুহৃদের সঙ্গে অন্যরকম চমৎকার একটা সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলো মিশুক। সেই সম্পর্কটা পিতা-পুত্রের বাইরেও অনন্যসাধারণ। বন্ধুর মতো। একটি ছেলের কৈশোর খুব জটিল একটা সময়। বয়:সন্ধির এই কঠিন দুঃসময়ে নিজের শারীরিক গঠনের আকস্মিক পরিবর্তনের ঘটনায় দিশেহারা হয়ে পড়ে একজন কিশোর। একটা অজানা অপরাধবোধ ওর সবকিছু উলোটপালোট করে দেয়। মিশুক আমাকে জানিয়েছিলো, যৌবন উঁকি দেয়া কৈশোরের গভীর গোপন বিষয়গুলো নিয়ে দ্বিধাহীন আলোচনা করেছিলো ওরা, পিতা আর পুত্রে। মিশুক তার পুত্রকে বলেছে, আমি যখন তোমার বয়েসী ছিলাম তখন আমার জীবনেও ঘটেছিলো এই রকম ঘটনা। সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে নিজের শরীরের কর্মকান্ডে ভয়ে কুঁকড়ে যেতাম আমি খামোখাই। কিন্তু তুমি কক্ষনো ভয় পাবে না। কারণ তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। এটাই প্রকৃতির নিয়ম।

বিশেষ রচনা

মনে পড়ে, একবার, ২০০৪ সালে আমাদের অটোয়ার বাসায় বেড়াতে এসেছিলো মিশুক মঞ্জুলি আর সুহৃদ। শীতের বিকেলে আমরা একটা শপিংমলে সেকেন্ড কাপ নামের একটা কফিশপে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে পরীর মতোন সুন্দর একটা কিশোরী হেঁটে গেলো। সুহৃদের মুগ্ধ চোখ মেয়েটাকে এক ঝলক অনুসরণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলো মিশুকের কাছে। গোঁফে দুষ্টুমির হাসি ঝুলিয়ে মিশুক তার পুত্রকে বলেছিলো–চাইলে ওকে আরেকবার আরেকটু দেখে আসতে পারো। গো এহেড। ফলো হার। সুন্দরকে দেখার মধ্যে ক্ষতি নেই কোনো, কিন্তু বাড়াবাড়ি যেনো না হয়।

গ্রেড সেভেনের সুহৃদ তো লজ্জায় একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেলো–না বাবা আমি ওকে দেখিনি তো!

দুমাস আগে মঞ্জুলি এসেছিলো আমাদের বাসায়। সঙ্গে সুহৃদ। ধাঁই ধাঁই করে বড় হয়ে গেছে সুহৃদ। ওর উচ্চতা আর ঝাঁকড়া চুলের মিষ্টি হাসি দেখে আমি আর আমার স্ত্রী একসঙ্গে বিস্মিত হই–আরে! ওযে দেখতে এক্কেবারে মিশুকেরই মতো!

হ্যাঁ, মিশুকের মতোই হতে চেয়েছিলো ওর পুত্রটি। মাসকম্যুনিকেশন এন্ড জার্নালিজমে ভর্তি হয়েছে সেই কারণেই। সুহৃদ আমাকে বলেছে, ওর ইচ্ছে--ভবিষ্যতে ঢাকায় গিয়ে বাবার সঙ্গে ইন্টার্নশিপ করবে। তারপর কাজ করবে মিডিয়ায়, বাবার মতোই। আহারে মামা! তোমার সেই আশাটি আর পুরণ হবার নয়!

কানাডায় খুব ভালোই তো ছিলো মিশুকের জীবন। বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, এআর ডি ওয়ান, ফক্স এবং স্টার টিভিতে কাজ করেছে। কাজ করেছে রিয়েল নিউজ নেটওয়ার্কে। কেনেডিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন সিবিসির ডক্যুমেন্টারি ফিল্ম 'রিটার্ণ টু কান্দাহার' -এর চিত্রগ্রাহক হিশেবে কাজ করেছে মিশুক।

রিটার্ণ টু কান্দাহারে ক্যামেরা চালানোর বাইরে লোকেশন সাউন্ডেও কাজ করেছিলো। রিটার্ণ টু কান্দাহারের চিত্রগ্রাহক হিশেবে বিখ্যাত জেমিনি এওয়ার্ড অর্জন করেছিলো মিশুক।

বিশেষ রচনা

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক জার্নালিজমের একজন পথিকৃৎ ব্যক্তিত্ব আমাদের মিশুক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে ব্রডকাস্টিং জার্নালিজম বিষয়ে অধ্যাপনা করেছে প্রায় দশ বছর। বাংলাদেশের টিভি সাংবাদিকতা মিশুকের হাত ধরেই আজকের আধুনিক মাত্রায় এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টেলিভিশন একুশে টিভির হেড অব নিউজ অপারেশন্স হিশেবে দায়িত্ব পালন করেছে। মিশুকের হাতে গড়া ছেলেমেয়েরাই এখন বাংলাদেশের সেরা টিভি সাংবাদিক।

এটিএন কর্ণধার মাহফুজুর রহমান নাকি মিশুককে কানাডার হিশেব মাফিকই পেমেন্ট করবেন। আমিও মিশুককে বাংলাদেশে যেতে উৎসাহ দিচ্ছিলাম।

বাংলাদেশের টিভি সাংবাদিকতা মিশুকের হাত ধরেই আজকের আধুনিক মাত্রায় এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টেলিভিশন একুশে টিভির হেড অব নিউজ অপারেশন্স হিশেবে দায়িত্ব পালন করেছে। মিশুকের হাতে গড়া ছেলেমেয়েরাই এখন বাংলাদেশের সেরা টিভি সাংবাদিক।

প্রায় প্রতিদিন কথা হতো তখন। ঢাকা থেকে ফোনে মিশুককে মুন্নী সাহা কি বলেছে জ ই মামুন কি বলেছে সব আমার সঙ্গে শেয়ার করতো। আমিও বাংলাদেশে চলে যাবো শুনে একটা নিয়মিত আইটেম করার কতো পরিকল্পনা করেছে মিশুক! কথা ছড়া আর কার্টুন নিয়ে হবে একটা ৩/৪ মিনিটের সেগমেন্ট। আমি দ্বিমত পোষণ করেছি–না রে ভাই, বাংলাদেশের মন্ত্রী এমপি সচিব আমলারা ফান সহ্য করতে পারবেন না। মানহানীর মামলা হবে রোজ। কিন্তু মিশুক মানতে চাইতো না।
বলতো, একটু মাইন্ড কোরো। অসুবিধে হবে না।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ একটি ঈদ সংখ্যায় আমি সদ্য প্রবাসী এক প্রবীণের কালচারাল শক তাঁর মর্যাদাহীন জীবনের হাহাকার এবং স্বদেশে ফিরে যাবার আকুতিকে বিষয় করে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। দাউদ হায়দারের একটি লেখার কারণে সেই ঈদ সংখ্যাটি নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমার লেখাটি তাই কেউ পড়েইনি। সেই লেখাটি নিয়ে একটি চলচ্চিত্র করার পরিকল্পনা করেছিলাম আমি আর মিশুক। মিশুকের টরন্টোর বাসায় মঞ্জুলি আর মিশুকের সঙ্গে বসে লেখাটির চিত্রনাট্যের খসড়া, শেষ দৃশ্যের সম্ভাব্য পরিবর্তন এবং মেইন কাস্টিং নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি ভোর রাত পর্যন্ত। হলো না। মিশুক চলে গেলো।

মিশুক তার বাবা মুনীর চৌধুরীকে হারিয়েছিলো বারো বছর বয়েসে। সুহৃদও প্রায় কাছাকাছি বয়েসেই তার বাবা মিশুক মুনীরকে হারালো!

বিশেষ রচনা

মিশুকের বাবার হত্যাকারী একাত্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনো হয়নি। সুহৃদের বাবার হত্যাকারীর বিচার কি হবে?

কিন্তু কি করে হবে? আমাদের পরিবহন সেক্টর তো এমপি মন্ত্রী অবঃ আর্মিদের নিয়ন্ত্রণে! এই সেক্টরের লুণ্ঠন বাণিজ্যের হর্তাকর্তা বিধাতা তো তাঁরাই।

আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল বড় বড় কথা বলেন। তাঁর হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা ধরনের হাস্যকর কথাবার্তা শুনতে শুনতে আমরা লজ্জিত হই। কিন্তু তিনি লজ্জিত হন না। নতুন কোনো রাস্তা তিনি নির্মাণ করতে পারেন না। পুরনো কোনো রাস্তা তিনি সংস্কার করতে পারেন না। মিডিয়ার সামনে দাঁত কেলিয়ে হাসেন আর উড়াল সেতু পাতাল সড়ক ইত্যাদি ধরণের গালগল্প করেন আর বিস্তর গোপন কমিশন গোণেন। তাঁর যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মাত্র দুদিন আগে চব্বিশ হাজার চালককে পরীক্ষা ছাড়াই ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করেছে!

অর্থাৎ আরো চব্বিশ হাজার ঘাতক ড্রাইভারকে মানুষ হত্যার লাইসেন্স দেয়া হলো! সেলুকাস!

অটোয়া নদীর পাশে দুই বন্ধু মিশুক মুনীর ও লুৎফর রহমান রিটন, ২০০৪। আলোকচিত্রঃ শার্লি রহমান

রোজন মাচা

সেবচন-৫০: সেজান মাহমুদ এর প্রবচনগুচ্ছ

উপদেষ্টা শৈলার সেজান মাহমুদ

“হুমায়ুন আজাদ প্রবচন কে নতুনভাবে জনপ্রিয় করেন কিন্তু তাঁর সময়েও ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, যেখানে পাঠক একটি বচন কে কেন্দ্র করে মতামত দিতে পারেন, তর্ক-আলোচনা করতে পারেন। সেজান মাহমুদ ফেসবুকের এই বিপ্লাত্মক যুগে নতুন করে প্রবচন কে আবারো জনপ্রিয় করলেন........”

রোজন মাচা

প্রবচনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্য ও দর্শনে সুপ্রাচীন। পৃথিবীর সকল জ্ঞান-ভান্ডারের সঙ্গে 'খনার বচন' কে পাশাপাশি স্থান দেয়া যায়। প্রাকৃতিক জ্ঞান, কান্ডজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, ব্যঙ্গ, তীর্যকতা, ধর্মানুষঙ্গ, এমন কোন বিষয় নেই যা প্রবচনে উঠে আসে নি। হুমায়ুন আজাদ প্রবচন কে নতুনভাবে জনপ্রিয় করেন কিন্তু তাঁর সময়েও ফেসবুকের মতো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, যেখানে পাঠক একটি বচন কে কেন্দ্র করে মতামত দিতে পারেন, তর্ক-আলোচনা করতে পারেন। সেজান মাহমুদ ফেসবুকের এই বিপ্লাত্মক যুগে নতুন করে প্রবচন কে আবারো জনপ্রিয় করলেন। তিনি বলেন "কোন নিন্দুক যদি আমাকে প্রশ্ন করে আমি 'সেজানের বচন' বা সে-বচন লেখার কে? তার উত্তরে বলবো,

"আগের যুগে প্রবচন লিখতেন পন্ডিতেরা, আর এযুগে প্রবচন লেখে সেজানেরা" কারো আপত্তি আছে? আমি এই সেবচনের নম্বর দিলাম 'শূন্য' (০)। এর পর থেকে এক, দুই এভাবে লিখতেই থাকবো।" এভাবে প্রতিনিয়ত বাড়ছে সে-বচনের নম্বর, এখন প্রায় একশ ছুঁই ছুঁই করছে। আর ফেসবুকে এর জনপ্রিয়তা যেমন বাড়ছে তেমনি চিন্তাশীল পাঠকদের অংশগ্রহণ। আমরা সেখান থেকে অর্ধশত সে-বচন এখানে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করলাম।)-

১ বাঙালির কাউকে মাথায় তুলে নাচতে লাগে তিনদিন, আর মাথা থেকে ফেলে পায়ে পিষতে লাগে এক সেকেন্ড

২। বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য তিন ধাপঃ

এক। চিন্তাশীল হওয়া করা বন্ধ করো

দুই। অন্যের জন্য ভাবনা বন্ধ করো

তিন। রাজ্য সম্পর্কে মাথা ঘামানো বন্ধ করো ব্যস, এখন তুমি সফল রাজনীতিবিদ

সেজান মাহমুদ

•[একাধারে লেখক, গীতিকার, কলামিস্ট এবং অধ্যাপক

•নিজেকে চব্বিশ ঘন্টার লেখক মনে করি, অন্যের ভাবনায় কিছু যায় আসে না। তবে জীবনের বিশালতার কাছে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারি নাই বলে চেয়ে থাকি সুদূর আগামীর দিকে]

৩। যাহাদের মিলিয়ন ডলারের বিমানে বা মিসাইলে বোমা বহন করিয়া একসঙ্গে লক্ষ মানুষ মারিবার সামর্থ্য নাই, বিধায় নিজ দেহে বোমা লাগাইয়া নিজে মরে এবং অন্যদের মারে তাহাদের টেরোরিস্ট বলা হয়।

৪। আজ মার্চ ২৩, ২০১১ মিরপুর স্টেডিয়ামে গালে, পেটে পাকিস্তানি পতাকা এঁকে ২৬ এ মার্চ এর শুভ উদ্বোধন হলো।

৫। কথায় কথায় বলা হয় 'আমার ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগিয়াছে', কেউ যদি বলে 'আমার নাস্তিকানুভূতিতে আঘাত লাগিয়াছে' তাহলে? অনুভূতি তো সবারই সমান!!

৬। যে দেশে স্কুল পাঠ্য বইতে 'দশ সের দুধে তিন সের পানি মিশিয়ে বিক্রী করে' অংক শেখানো হয়, সে দেশ যে দূর্নীতিতে সেরা হবে এতে অবাক হবার কিছু আছে কি?

৭। কমার্শিয়াল সিনেমার ফর্মুলাঃ গরীব নায়কের সঙ্গে ধনীর দুলালীর প্রেম, খুন ও তার প্রতিশোধ, ধর্ষণের চিত্র, শাদা-শাড়ি পরিহিত নায়িকার বৃষ্টিতে ভিজে সখীদের সঙ্গে নৃত্যগান, সবশেষে প্রেমের জয়, ব্যস-সিনেমা হিট হতে বাধ্য। এখন রাজনীতিতে সফল হওয়ার ফর্মুলাঃ পরিবারতন্ত্র থেকে আগমন, সন্ত্রাসীর তালিকায় শীর্ষে অবস্থান, দু' এক বার জেল-হাজতে যাওয়া, নিদেনপক্ষে কয়েক শ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার রেকর্ড, ব্যস, রাজনীতিতে হিট হতে বাধ্য!

"যে দেশে স্কুল পাঠ্য বইতে 'দশ সের দুধে তিন সের পানি মিশিয়ে বিক্রী করে' অংক শেখানো হয়, সে দেশ যে দূর্নীতিতে সেরা হবে এতে অবাক হবার কিছু আছে কি?"

৮। হুমায়ূন আজাদের দুর্ভাগ্য তিনি বাংলাদেশে জন্মেছিলেন, শুধু বুদ্ধিবৃত্তি চর্চ্চার জন্য বারংবার চাপাতিঘাত খেয়েছেন; হুমায়ূন আহমেদের সৌভাগ্য তিনি বাংলাদেশে জন্মেছেন, শুধু আবেগবৃত্তি চর্চ্চার জন্য বারংবার প্রেমাঘাত পেয়েছেন।

"যৌনকর্মী আর (কিছু) বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক জায়গায় খুব মিল আছে, যৌনকর্মীরা বৈশ্যবৃত্তি করে অন্য কোন জীবিকার অভাবে, আর (সেই) বুদ্ধিজীবীরা বৈশ্যবৃত্তি করে সৎ সাহসের অভাবে; দুজনেই অভাবী!"

বর্তমান বাসস্থান: ফ্লোরিডা, আমেরিকা
জন্মতারিখ: সেপ্টেম্বর ১
সন্তান: ২ জন

আমেরিকার ডলারের গায়ে লেখা আছে, 'ইন গড উই ট্রাস্ট'। প্রকারন্তরে, আচরণে, আমেরিকা ডলারকেই 'গড' মনে করে!!

১০। পন্ডিতেরা বলেন ভাষা, বাগধারা একটি জাতির পরিচয় বহন করে; 'নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ' বাঙ্গালি জাতির পরিচয়?

১১। মানব-মানবীর রোমান্টিক সম্পর্ককে একটি থ্রী-কোর্স ডিনারের সঙ্গে তুলনা করা যায়; যেখানে প্রেম হলো এপেটাইজার, শরীর হলো মেইন কোর্স, আর ডেজার্ট হলো আবারো প্রেমে পড়ার উদ্যম খুজে পাওয়া

১২। যৌনকর্মী আর (কিছু) বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এক জায়গায় খুব মিল আছে, যৌনকর্মীরা বৈশ্যবৃত্তি করে অন্য কোন জীবিকার অভাবে, আর (সেই) বুদ্ধিজীবীরা বৈশ্যবৃত্তি করে সৎ সাহসের অভাবে; দুজনেই অভাবী!

১৩। বাঙালির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 'ডায়ারিয়া'র একটি বিশেষ মিল আছে; বাঙালি তাদের জাতীয় ব্যক্তিত্বদের টেনে নিচে নামিয়ে আনে; রবীন্দ্রনাথকে তার আসন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হয়, জাতির জনককে টেনে নামানো হয়, স্বাধীনতার ঘোষককে টেনে নামানো হয়, এখন নোবেল লরিয়েট কে নামানো হচ্ছে- অর্থাৎ উভয়ই নিম্নগামী।

১৪। আমেরিকা যখন অন্য দেশে গণতন্ত্রের কথা বলে তখন গণতন্ত্রের সজ্ঞাটি অন্যরকম; তা হলো 'গণ হারে সেই দেশের তন্ত্র ছিঁড়ে ফেলা'।

১৫। প্রতি শুক্রবার মসজিদের শহর ঢাকায় যত মানুষ নামাজ পড়ে বের হন, শুধু তারাই যদি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন তারা সৎ মানুষ, তাহলে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যেতো।

১৬। 'প্রফেসর ইউনুস সম্মান রক্ষা কমিটি' করা হয়েছে। এখন বাংলাদেশে 'সম্মান' ও কমিটি করে রক্ষা করতে হয়। যাদের 'মান-ইজ্জত' নেই তারা তাহলে ভাগ্যবান, না হলে তাদেরকেও 'ইজ্জত রক্ষা কমিটি' করতে হতো!!

১৭। ফ্যাশন এবং সস্তা জনপ্রিয়তার মধ্যে গভীর একটি মিল আছে, তা হলো কদর্যতা; এজন্য কিছুদিন পরপরই এদের বদলাতে হয়।

১৮। মেরুদন্ডহীনেরা অন্যের দিকে কাদা ছুঁড়ে দেয়, আর যোগ্যতরেরা দেয় কর্মের চ্যালেঞ্জ!।

১৯। একমাত্র স্বপ্ন দেখার সময়েই আমরা পরিপূর্ণভাবে মুক্ত থাকি; এজন্যেই যারা স্বপ্ন দেখতে জানে তারাই দুনিয়াকে বদলায়।

২০। বাংলা নববর্ষে পান্তা-ইলিশ খাওয়া নিয়ে বিতর্ক, বাউলদের দাড়ি কাটা, সম্মান নিয়ে অসম্মানের কাজ, ইত্যাদি দেখলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো তার কবিতা পালটে লিখতেনঃ "সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী, করেছো ষোল কোটি মানুষ করোনি!

২১। বাহরাইনের কবি 'আয়াত আল গেরমেজি' কে ধর্ষণ ওঁ নির্যাতন করে মারা হয়েছে শাসকের নিন্দা জানিয়ে কবিতা লেখার দায়ে। এখন ২০১১ সাল, কারো কি মনে পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে কবি 'আবু কাব্ব' কে মারা হয়েছিল যড়যন্ত্রের দায়ে, নবীর যুগে। হাজার বছর পরেও মধ্যপ্রাচ্য বদলায় না!!

২২। বাংলাদেশের সংবিধানের শুরুতেই 'বি্সমিল্লাহে রাহমানূর রাহীম" যুক্ত করা হয়েছে। আমার বন্ধু/বান্ধবী 'পংকজকান্তি সূত্রধর' বা 'সুব্রত গোমেজ' বা 'চেনং বোধী' যতোই বুদ্ধিমান/বুদ্ধুমতি ও যোগ্য মানুষ হউক না কেন তারা কোন দিন প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হতে পারবে না, হলেও তাদের অবস্থান দুই নম্বরে।

২৩। হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন 'আগামী সপ্তাহে কোন ক্রাইসিস হতে পারে না, কারণ আমার আগামী সপ্তাহের স্ক্যাজুয়াল (সিডিউল) পূর্ণ হয়ে আছে' ; কিসিঞ্জারেরা আগামী এক সপ্তাহের নয়, এক বছরের ক্রাইসিস আগেই তৈরি করে রাখতে জানে। এজন্যেই দুনিয়ায় এতো বেশি ক্রাইসিস!

২৪। শ্রমশোষণ মজ্জাগত, তারচেয়েও বেশি মজ্জাগত দাসত্বের মনোভাব, রাজ-বিয়ে নিয়ে মাতামাতি তাই-ই প্রমাণ করে।

২৫। হত্যাকান্ড তা যতোই ন্যায়প্রতিষ্ঠার নামে করা হোক না কেন, তা হত্যাকান্ডই; এটাকে উদযাপন করাকে খুনীর উল্লাস ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

২৬ । মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়, অজানা কে ভয় পায়, অনিশ্চয়তাকে ভয় পায়, আর ভয় হলো সকল কুসংস্কারের সূতিকাগার। অথচ মৃত্যু, অজানা, অনিশ্চয়তা আছে বলেই জীবন অর্থবহ, আর জয় করার আনন্দে জীবন পরিপূর্ণ হয়।

২৭। যারা মনে করে একজন নারী আর একজন পুরুষ কে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে তারা মূলত বোকার স্বর্গেই বাস করে।

২৮। প্রেম মানবিক সম্পর্কের মধ্যে মধুরতম, আর প্রেমাসক্তি মানসিক রোগের মধ্যে চতুরতম।

২৯।অন্তত একটি জায়গায় নজরুল আমার কাছে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড়; রবীন্দ্রনাথ যেখানে 'চরণধুলার তলে' মাথা নত করেছিলেন, নজরুল সেখানে 'ভগবান বুকে পদচিহ্ন' এঁকে দিয়েছিলেন।

৩০। বিশ্বকবি নজরুল হলে ভালোই তো, বঙ্গভাষায় দু'জন বিশ্বকবি পাওয়া গেল! কিন্তু একজনকে নতুন করে বানাতে অন্যজনকে আবার যেন 'বিশ্বকবি' থেকে নামিয়ে 'ভারতীয় কবি' বানানো না হয়।

৩১। মাতৃত্বের/পিতৃত্বের চেয়ে একটি বিস্কুট বা খেলনার দাম একটি শিশুর কাছে অনেক বড়, তারপরও মানুষ মাতৃত্ব/পিতৃত্ব কে মহিমান্বিত করে।

৩২। নজরুল বলেছিলেন 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছো মহান', দারিদ্রের মধ্যে কোন মহত্ব নাই, আমাদের তা মহানও করে না; এজন্যেই আমারা দারিদ্র দূর করার চেষ্টা করি।

৩৩। মানুষ অন্যের সাফল্য দেখে বাইরে বলে বাহ, আর আড়ালে বলে যাহ

৩৪। প্রবাদে বলে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী', অথচ পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম প্রতিটি কাজের পেছনে রয়েছে 'বেশি বিদ্যা'র মানুষেরা।

৩৫। নারীরাই নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা।

৩৬। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের স্মৃতিশক্তি আর সাগরের বালুকাবেলায় কিছু লেখার মধ্য খুব মিল আছে; দুটোই খুব দ্রুত মুছে যায়। বালুকাবেলার জন্য প্রয়োজন ঢেউয়ের তোড় আর রাজনীতিকদের জন্য প্রয়োজন পশ্চাৎদেশে জনগণের গদাম-করিয়া-দেয়া লাথথি।

৩৭। টাকা কড়ি দিয়ে সুখ আসে না, কিন্তু তা দিয়ে বড় একদল গবেষকদের বেতন-ভাতা দিয়ে, সংসার চালিয়ে গবেষণা করে দেখা যায় আসলেও সুখ আসে কি না।

৩৮। একজন মানুষের তিনটি পরিচয়, সে নিজেকে কী ভাবে, অন্যেরা তাকে কী ভাবে, আর সে আসলে কী; এই তিন পরিচয়ের মধ্যে দূরত্ব কম থাকাটাই জীবনের মোক্ষধাম।

৩৯। সাহিত্য-তত্ত্ব-দর্শন এক সূত্রে গাঁথা, কোন কোন ক্ষেত্রে তা এখন সমার্থক, একথা যারা মানতে চান না তাদের সাহিত্য করা আর না করা নিয়ে সাহিত্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

৪০। নির্বুদ্ধিতার একটি বড় সুবিধা হলো কেউ অনায়াসে আইনস্টাইন কে স্টুপিড আর রবীন্দ্রনাথ কে অ-কবি বলে ফেলতে পারে, আর মধ্যমানের বড় সুবিধা হলো আইনস্টাইন আর রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই বুঝতে পারার আত্মতৃপ্তি নিয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে সুখে থাকতে পারে।

৪১। তোমারা দিন-রাতভর চাইতে চাইতে ছ্যাঁচড়া হয়ে গেছো, আর আমি কিছুই চাই না, তাই ঈশ্বর-ই উলটো আমাকে খুশি করার জন্য বেশি দেন।

৪২। নতুন কিছু গ্রহণ করা নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়; উদ্ভাবক (২.৫%); দ্রুত-গ্রহণকারী (১৩.৫) =সবার আগে নতুন উদ্ভাবন কে গ্রহণ করে; আগাম-সংখ্যাগরিষ্ঠ (৩৪%)= একটু দেরিতে হলেও গ্রহণ করে; বিলম্বিত-সংখ্যাগরিষ্ঠ (৩৪%)=অন্যেরা করার পরে করে; আর অচল (১৬%)=এরা শুধুই পুরনোকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়।

৪৩। নাস্তিকের সংজ্ঞা হলো 'যে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না'; তাহলে ঈশ্বর স্বয়ং সবচেয়ে বড় নাস্তিক, কারণ তিনি তাঁর নিজের কোন সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করেন না।

৪৪। গরীবেরা বাধ্য হয়ে বারো মাস ধরে সিয়াম সাধনা করে, ধনীরা সিয়াম সাধনার নামে এক মাস আহারযজ্ঞ করে, তারপর করে বাজার-যজ্ঞ, আর বাকি এগারো মাস সেই উপলক্ষে ঘুষ-দুর্নীতি-যজ্ঞ।

৪৫। নারী আর মুঠোফোনের মধ্যে গভীর মিল খুঁজে পাই; দুজনকেই সযতনে ধরতে হয়, কথোপকথন চলে প্রচুর, আর ভুল বাটনে চাপ দিলেই সংযোগ বিচ্ছিন্ন!!

৪৬। পুরুষের বৈশিষ্ঠ্যের সঙ্গে চুম্বকের গভীর মিল খুঁজে পাই, প্রাকৃতিক নিয়মে উভয়েই বিপরীত মেরু, বিপরীত গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়; একারণেই পুরুষেরা সুন্দর এবং বুদ্ধিমতী নারী খোঁজে।

৪৭। হায়াত, মউত, রিজক আর দৌলত আল্লাহর হাতে; মুসলিম দেশগুলোতে মানুষের গড় আয়ু ৬২ আর অমুসলিম জাপানিজদের ৮২.৯ বছর, মুসলিম দেশগুলোর এক তৃতীয়াংশেরও বেশি জনসংখ্যা পর্যাপ্ত খাবার না খেয়ে প্রতি রাতে ঘুমাতে যায়, অমুসলিম দেশগুলোর গড় পার ক্যাপিটা (৬০০০) মুসলিম দেশগুলোর (৩২৩০) দ্বিগুণ, সবচেয়ে বড় বৈষম্য মুসলিম দেশগুলোতে (কুয়েতের পার ক্যাপিটা ১৮,২৭০ ডলার ভারসাস ইথিওপিয়া মাত্র ১০০ ডলার); প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কি মুসলমানদের পছন্দ করেন না?

৪৮। ভাষা দিয়ে নাকি বৈশিষ্ট্য কে বোঝা যায়; যেমন বাঙ্গালির বৈশিষ্ট্য নিম্নগামি- একারনেই আমরা রাজনীতিতে নামি, অভিনয়ে নামি, আন্দোলনে নামি; আমাদের কোন উত্তরণ নাই।

৪৯। বিজ্ঞানমনস্কতা একটি দর্শন, একটি প্রসেস। ডাক্তারি, ইঞ্জিনীয়ারিং বা অন্য বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ে, এমন কি একটি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেও তা তৈরি হয় না। বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া একধরনের সাধনা, পুরনো কে ঝেড়ে ফেলে কঠিন, কঠোর সত্যকে গ্রহণ করার সাধনা। বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া মানব সমাজের মুক্তি নেই।

৫০। বাঙ্গালির চরিত্রগত বৈশিষ্ঠ্যের সহিত কাকপক্ষীর গভীর মিল খুঁজিয়া পাই, নিজের কেহ মরিলে কা-কা- রবে দলবদ্ধভাবে ছুটিয়া আসে, কলরব করিয়া ধরণীরে মাথায় তুলিয়া লয়, পরিশেষে সেই নিজ বান্ধবের মৃতদেহ ঠুকরাইয়া খাইতেও দ্বিধা করিবার বালাই থাকে না।

খনার বচন

বাড়ীর কাছে ধান পা

বাড়ীর কাছে ধান পা,
যার মার আগে ছা।
চিনিস বা না চিনিস,
ঘুঁজি দেখে কিনিস।

খনা ডাকিয়া কন

খনা ডাকিয়া কন,
রোদে ধান ছায়ায় পান।

তপ্ত অম্ল ঠাণ্ডা দুধ

তপ্ত অম্ল ঠাণ্ডা দুধ
যে খায় সে নির্বোধ।

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শোন পতির পিতা,
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা।
রাজ্য নাশে, গো নাশে, হয় অগাধ বান,
হাতে কাটা গৃহী ফেরে কিনতে না পান ধান।

ফাল্গুনে আট, চৈতের আট

ফাল্গুনে আট, চৈতের আট,
সেই তিল দায়ে কাট।

কবিতা শৈলী

ক্রি কে টে র উ ল্লা সে কাঁ পা

(উৎসর্গ:বাংলাদেশ ক্রিকেট দল)

শত্রুর আঘাতে পরস্পর চিনেছি আমরা
বহুবার
পাড়ি দিতে দিতে রক্তগন্ধা পথ পিচ্ছিল
কাদার
বর্ষায় ভিজেছে একবার আর ফেটে গেছে
চৌচির গ্রীষ্মের রাগে, আঘাতে আঘাতে
হাতগুলো মুঠি হয়ে আসে - খণ্ড খণ্ড মন
বিভাজিত দাগ মুছে ফেলে যখন অখণ্ড হ'ল
বজ্রনির্ঘোষে - শত্রুর মুখে দিয়ে ছাই
হিমালয় ... হিমালয়, দেখিনি যদিও
কোনোদিন তবু অনুভব করেছি তোমায় !

জোয়ারের টানে কত জল কোথা থেকে এল
কেমন গম্ভীর ডুব ডুব নৈঃশব্দ তাড়িত
পাড়ের আরোহী রেখা গেল ভরে
এমন সম্পন্ন বোধে আয়না হতে লাগে
প্রবাহের অবিরল বেগ ... ভাটির করুণ মুখ
তখনি যে ভেসে ওঠে হাহাকারে

সজোরে মেরেছ বল উপবৃত্ত পথে
পার হয়ে যাচ্ছে দ্রুত মাঠের ওপারে
গর্জনে অখণ্ড মন গ্যালারিতে ফেটে পড়ে
কত দূরে বঙ্গোপসাগর?
শঙ্খনদ মিলেছে যেখানে সাগরের সাথে
ধূ ধূ মোহনায় নীল – সবুজ সুন্দরবন
বাঘের গর্জনে উল্লসিত কাঁপে !

তুষার গায়েন

•কবি তুষার গায়েন

•নব্বই দশকের কবি

•বই সংখ্যা: দুটি, নীলভবহ্রদ এবং বৃষ্টির অন্তর ত্রাস

•বর্তমান অবস্থান: টরোন্ট, কানাডা।

কবিতা শৈলী

গর্জন করেছি এর আগে কবে একসাথে
সমূহ দেহের জাড্য ভেঙে ফেলে উত্তাল
রুপে
দমনের ইতিহাস ভেঙে তছ্নছ্ ...
তবু জিঘাংসার রাত ফিরে ফিরে আসে
খণ্ড খণ্ড করে ফেলে আবার অখণ্ড মন
বুক চেরা চিন্ চিন্ দীর্ঘশ্বাস ...
কত রাত ভাঙা প্রহরের চাঁদ গুনে
অখণ্ড আবেগে কাঁপা সামিয়ানা
অবশেষে শিশিরে ভিজেছে

ওগো ছেলে ! জোয়ার ভাটার চাপ কী
বয়ে যায় শিরায় শিরায় তোমাদের ধম
এই তো জলের স্ফীতি ছোঁয় পাড়ের দু'
আবার হ্রাসের হাহাকার জাগে প্রবাহের
তলদেশে !
তবু তো ধানের দেশ, বপন করেছি ধান
রোয়ায় রোয়ায় বীজতলা থেকে নিয়ে -
বিধ্বংসী ঝড়ের মার, সূর্যরাগ ঠেলে
জানি, ছড়ায় ছড়ায় সে ধান হেমন্তে এসে
ফলে !

টরন্টো
মার্চ ১৫, ২০১১

এলো মেলো

বাবা কত বড়!

উপদেষ্টা শৈলার টোকন ঠাকুর

"....আজ টের পাই, বুঝতে পারি, বাবা তার পুত্রকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্যই নিজে থেকে দাবার ঘুঁটির চাল দিয়ে হেরে গিয়েছিলেন। কারণ, আমি কতো ছোট, আমার বাবা কতো বড়। এটাই সত্য, চিরকা"

বাবা দিবস। আব্বা দিবস। ওইদিন পিতার দিন। ইট ইজ ফাদার ডে। আমরা বাবাকে নিয়ে আছি। আব্বাকে নিয়ে থাকবো। পিতার জন্য কাটাবো। ফাদারের স্মৃতি নিয়ে হাঁটবো। আজ ড্যাড ডে, আজ ড্যাডির সঙ্গে গার্ডেনে যাবো, আজ বাবাও হয়তো আমার মতো ফড়িং ধরতে ধরতে ধরতে ধরতে ধরতে সারা দুপুর স্কুল মাঠের কোণার দিকে ফড়িয়ের পিছু হাঁটতে হাঁটতে, ফড়িংয়ের সঙ্গে উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে আজ আমরাও ফড়িং হয়ে যাবো। আমি ভাবি, আমার মতোই একদিন বাবাও ফড়িং ধরতে গিয়ে স্কুলের পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় একটা মাঠের দিকে হেঁটে যেতে। মাঝে মাঝে ফড়িং আর ধরাই যেতো না। মাঝে মাঝে আমিও তাই বাড়ি ফিরি না।

আজ ড্যাডি ডে। আব্বা দিবস। বাবা দিন। বাবা বাবা দিন। ...অথচ একদিন, বলা যায় এই সেদিনও এ দেশে বাবা দিবস ছিল না। আমরা জানতামই না, বাবা দিবস আবার কী জিনিস? আমরা জানতামই না, বছরের একটা দিন শুধু আব্বাময়, বাবাময়! বরং আমরা জানতাম, প্রতিদিনই পড়তে বসি, অব্বা এসে অঙ্ক ঠিক করে দিচ্ছেন। ইংরেজি বানান ধরছেন। পড়ার সান্নিধ্যে কাটতো প্রত্যেক দিনই। বাবার হাতের আঙ্গুল ধরে মাঠের মধ্যের আলপথ ধরে হেঁটে হেঁটে অনেক অনেক দূরে চলে যেতাম। দিন পেরিয়ে রাতেও যেন কোথায় কোথায় যেতাম। সেসব ছোটবেলার গল্প। গল্প না, সত্যি। সেই সত্যিগুলোও এখন অ্যালবাম ভরা ছবি হয়ে গেছে। বাবা হয়তো আজ এই ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে একটা দিবস হয়ে গেছেন! তাই বাবা দিবসের অনুষ্ঠান চলছে দিকে দিকে, পেপারে, টিভিতে, রেডিওতে। কিন্তু বাবা কোথায়? জাস্ট দুটো ঘটনা। একটা হচ্ছে, আমাদের বাড়ির পেছনে ছিলো একটা বড় বাগান। সেই বাগানে বিরাট একটা লিচু গাছ ছিলো। সেই লিচু গাছে ছিলো বিরাট এক মৌচাক। একদিন, কারা যেন সেই মৌচাকে দিলো ঢিল। আর খবর হয়ে গেলো। শতসহস্র মৌমাছি আক্রমণ করে বসলো পুরো পাড়ায়। মানুষ যে যার মতো করে পালাচ্ছিলো, দৌড়াচ্ছিলো। মৌমাছিরাও মানুষের পেছনে ধাওয়া করছিলো। মানুষকে ধরে ধরে মৌমাছিরা হুল ফুটিয়ে দিচ্ছিলো। আমি তো খুব ছোট।

টোকন ঠাকুর

নিজের সম্পর্কে: আমি একটি রাক্ষস, মানুষের ছদ্মবেশে থাকি, কবিতা লিখি।
ভালবাসেন: মানুষ
প্রিয় ব্যক্তিত্ব: ফিদেল কাস্ত্রো, ইন্দিরা গান্ধী
অবসরে: আমার কোন অবসর নাই
নতুন কবিদের উদ্দেশ্যে: রক্ত দিয়ে কবিতা লিখ।

এলো মেলো

তাই আমার পিতা আমাকে নিয়ে মৌমাছির হুল থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের বাড়ির সামনের কাচারি ঘরের পাশে একটা মেওয়া গাছ ছিলো, সেখানেই সঙ্গে আনা একটা কাথার মধ্যে ডুকিয়ে দিলেন। আমি হামাগুড়ি দিয়ে সেই কাথায় মুড়ি দিয়ে বসে থাকলাম। কাথার মুখ একদিকে একটুখানি খোলা, আলো-বাতাস-নিঃশ্বাস ফেলার জন্য। আর ঐ খোলা মুখ দিয়ে যেন কোনো মৌমাছি ঢুকতে না পারে, সেই দায়িত্ব পিতার, সেই দায়িত্ব বাবার। অনেক মাছি উদভ্রান্ত সৈন্যদের মতো ছুটে ছুটে আসছিলো। আমার পিতাকে কি মৌমাছিরা কামড়াচ্ছিলো না? আমার বাবা সেই মাছি নিজের হাতে ঘষা দিয়ে মারছিলেন। আর বাবা খেয়াল রাখছিলেন, মৌমাছির হুল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাকে কাথার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও, আলো-বাতাসের প্রবেশ-মুখে যদি কোনো মৌমাছি ঢুকে পড়ে, সেটা প্রবেশ মুখেই মারা পড়ছিলো তার দুহাতের তালুর মধ্যে পড়ে। পুত্রকে রক্ষায় পিতার কার্যক্রম দেখছিলাম আমি। তার নিজের অবশ্য মৌমাছির হুল সহ্য করতে হচ্ছিলো এবং সেটা তার পুত্রকে সেইফ রাখার জন্য।

পরে, মৌমাছির আক্রমণ থেমে গেলে, দেখা গেলো, হ্যাঁ, আমাকে কোনো মাছি হুল ফুটাতে পারেনি সত্য, আমার বাবার গায়ে অনেকগুলো হুল ফুটিয়ে গেছে তারা; মৌমাছিরা। বাবার কি হুলের বিষে জ্বর এসে গিয়েছিলো?

বা বা
ক ত
ব ড়!

আমি মাঝে মধ্যেই সেই মৌমাছিদের কথা, সেই আমাদের তেঁতুলগাছের মৌমাছিদের কথা ভাবি। ভাবি সেই যে, পুত্রকে বাঁচাতে বাবার সহ্য ক্ষমতার কথা। অথচ এখন দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, বাবার সঙ্গে আর সেই নিত্যদিনের দেখা হওয়াটা হয় না। কারণ, ঝিনেদা আর ঢাকার মধ্যে দুইশো কিলো দূরত্ব। বাবা-মা-বোন-ভাগ্নিরা থাকেন ওখানে। আমি থাকি এমন এক শহরে, যেখানে কোনো ফড়িং নেই, প্রজাপতি নেই, সন্ধ্যায় জোনাকি নেই। রাতের বেলায় হুতোম পেঁচাও নেই।
আর একটি ঘটনা। নৌকায় করে গাড়াগন্ধ থেকে কুমার নদের ওপর দিয়ে যাচ্ছি শ্রীপুর, মাগুরার মধ্যে। শ্রীপুরে তখন বাবার চাকরি। নৌকায় আমরা পাঁচজন। মা-বাবা-দুই বোন ও আমি। নদের দু'ধারের গ্রাম আর বাঁকগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে নৌকা। আমি আর বাবা দাবা খেলছি। দাবা খেলাটা আমি শিখেছি আমার বাবার কাছে। কোন ঘুঁটি কয় ঘর চলে, সব বাবার কাছেই শেখা। প্রথম প্রথম আমিই দাবায় হারতাম বাবার কাছে। কিন্তু ঐদিন, নৌকায় বসে আমি দুইবার হারলেও প্রথম বারের মতো একবার জিতলাম। বাবার রাজাকে মাত করে দিলাম। বাবা হেরে গেলেন। তখন কতো ছোট। বাবা কতো বড়।

আজ টের পাই, বুঝতে পারি, বাবা তার পুত্রকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্যই নিজে থেকে দাবার ঘুঁটির চাল দিয়ে হেরে গিয়েছিলেন। কারণ, আমি কতো ছোট, আমার বাবা কতো বড়। এটাই সত্য, চিরকাল।

সাক্ষাৎ-কার

অ্যামস্টারডাম শহরের স্টেশানের সামনে।

শৈলার শৈবাল

মলয় রায়চৌধুরীর সাক্ষাৎকার

“ ... কলকাতার বিখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক মলয় রায়চৌধুরী। কথা হয় উনার সাথে অনেকক্ষণ। শৈলীর পক্ষ থেকে সাক্ষাৎকারটি নেন শৈবাল.... ”

শৈলী প্রতিবেদক: মলয় রায় চৌধুরী , আপনার চিঠিতে সম্ভাষণে লিখা থা মলয়দা ! ময়লদা বলেই শুরু করি , কেমন আছেন, গত শীতটা কেমন কাটলো, আঙুলের ব্যথ্যা কী কমেছে ?

মলয় রায় চৌধুরী: কবিরা মলয়দা বলেই ডাকেন। অনেক তরুণ-তরুণী অবশ্য কাকুও বলেন। মুম্বাইতে শীত প্রায় পড়েই না বলা চলে। পথের দিকে তাকালে মনে হয় এ-শহরে আট মাস বসন্তকাল আর চার মাস বর্ষাকাল। না হে, আঙ্গুলের ব্যথা আর যাবার নয়; কত রকমের ট্রিটমেন্ট করাই, কোনো ফল হয় না।

শৈলী প্রতিবেদক: ছাপা লেখার ভক্ত আর ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ফেন কতটুকু তফাত্ত বুঝতে পারেন, "নেটিজেন কবি" শব্দটা শুনতে কেমন ?

মলয় রায় চৌধুরী: পশ্চিমবাংলায় ছাপালেখারই প্রাধান্য । সরকার কমপিউটার ঢুকতে দেয়নি। যখন কিনা বাংলাদেশে কমপিউটার বহু আগে প্রবেশ করছে। সরকার ইংরেজি তুলে দিয়েছিল, অথচ সাইবার কাফেগুলোয় বাংলা নেই, কেবল ইংরেজি। এদিকে সরকারি গ্রন্থাগার সব উইপোকার আড়ত। ভারতে ইলেকট্রনিক বাংলা কবিতা আপাতত একটা ক্লাবঘরের মতো। অনেক সময় লাগবে। আমি নেটিজেন, অবশ্যই। কিন্তু নেটিজেন কবি নই। কেননা কবিতা লিখতে হলে একটা রচনাকে বহুদিন, বহুক্ষণ ঘষামাজা করতে হয়। তারপরও তা প্রকাশ করার ইচ্ছা নাও হতে পারে।

ডেন হাগ শহরের ফুটপাথে স্ত্রী শলিলার সঙ্গে

স্ত্রী শলিলার সঙ্গে অ্যামস্টারডামের একটি খালের লঞ্চে রেমব্রাঁ মিউজিয়ামে যাবার পথে

শৈলী প্রতিবেদক: কবিতা এক ধরনের এডিকসান তবে নেশা নয়, অনেকটা সাইকোট্রপিক ড্রাগসের সাথে তুলনা করেছেন! অনেকদিন তো কবিতা লিখেন না উইড্রয়াল সিমপটোম কী কিছু বলতে পারবো, নাকি নিজে থেকেই ঘোর কেটে গেছে?

মলয় রায় চৌধুরী: হ্যাঁ, কবিতা এক ধরণের অ্যাডিকশান ছিল, যার জন্যে আমরা সবাই জীবন নষ্ট করার পথে চলে গিয়েছিলুম; ফালগুনী রায় আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায় অকালে মারা গেলেন; সুবো আচার্য অনুকুল ঠাকুরের শিষ্যত্ব নিয়ে ধর্মে আশ্রয় খুঁজলেন, আমাকে কবিতা লেখার জণভে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে পথে হাঁটানো হল, ইত্যাদি। কবিতার উইথড্রল হয় না। একবার আঁকড়ে ধরলে ছাড়ানো যায় না। এখন অন্যের কবিতা পড়ি।

শৈলী প্রতিবেদক: কবিতা কেন লিখেন না , কখনো বলেছেন মস্তিষ্কের রসায়ণ আর বৃদ্ধা আঙুলের ইরিটেসন এক হয় না , কখন বলেন মাঝে মাঝে মনে হতো আর পাঠকের প্রয়োজন নেই ?
নাকি নতুন করে বলার কিছু নেই

মলয় রায় চৌধুরী: তা ঠিক। এক এক সময় এক এক ধরণের চিন্তা আসে। তবে মোদ্দা কথা কবিতা বেশ কিছুদিন আসছে না মাথার ঘিলুতে। হাইকু লেখার প্রয়াস করে দেখছি আপাতত।

শৈলী প্রতিবেদক: "সাহিত্যে সনাতন অনুশাসনগুলোর বিরুদ্ধে চৌধুরীর বিদ্রোহ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য " আপনি বলেন বয়সন্ধিতে কবিতায় এডিক্ট ছিলেন ! এখনো কী এই দ্রোহ কিংবা মোহ নতুনদের দেখতে ইচ্ছে করে ?

মলয় রায় চৌধুরী: নতুনদের মধ্যে দেখতে চাই কিন্তু পাই না। পশ্চিম বাংলায় বর্তমান এসট্যাবলিশমেন্ট কবিদের একেবারে শিরদাঁড়াহীন করে দিয়েছে। আসলে সমাজের কথা না ভাবলে ওই দ্রোহবোধ তৈরি হয় না। প্রায় সকলেও কোনো না কোনো ধান্দাবাজি করে চলেছে। এই এসট্যাবলিশমেন্টে হয়তো রদবদল হবে খুব শীঘ্রই। তার অপেক্ষায় আছি।

শৈলী প্রতিবেদক: প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতা কিংবা জখম এর মতো উচ্চারণ রক্ষনশীল পরিপাটি প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর করলো ,তখন যৌনতা ছিল বয়সন্ধিতে মগজের আর শরীরের মিশেল কিন্তু এই বয়স মগজের ব্যাপার ,এখন ভাবণা সমাজিক ক্রোধ নিয়ে,"কুকুর যুবার মনো মালিন্য ভরা মাঝ রাতে কীটনাশকের ঝাঁঝে মজে থাকা ফড়িংএর রুগ্ন দুপুরে ভূজ্ঞানসম্পন্ন কোঁচো উঠে আয় চাকুর লাবন্য আমি আরেকবার এ তল্লাদে দেখাতে এসেছি[প্রস্তুতি] " ক্রোধের সেই তল্লাট কী এখনো আছে ?

মলয় রায় চৌধুরী: ২০০৪ পর্যন্ত কবিতায় ছিল । এখন তো লিখছিই না, তাই ক্রোধকে চালিত করার মাধ্যম নেই। এখন আমার ক্রোধ আরো বেশি, কেননা অভিজ্ঞতা যা অর্জন করেছি তা তো বিপুল।

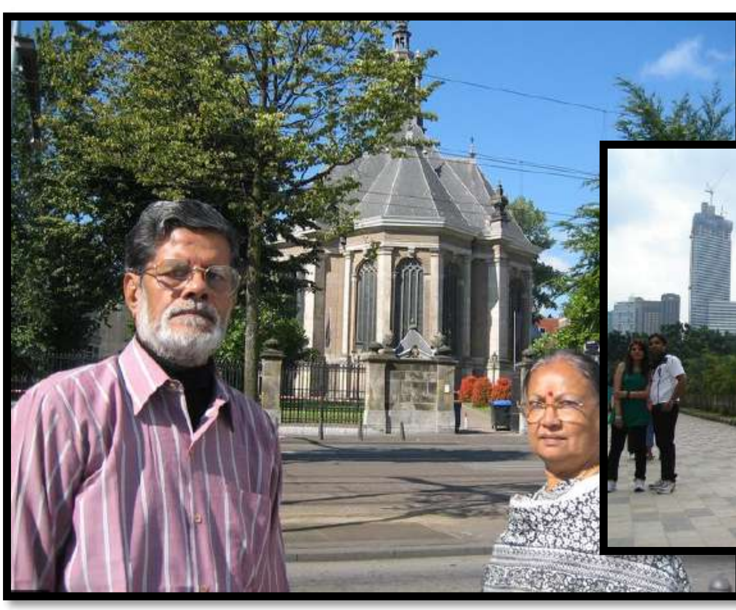

ডেন হাগ শহরে

মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস টাওয়ারের সামনে

শৈলী প্রতিবেদক: আমি নাকি গাইডের কাছে ইতিহাস শেখা ফোস্কা পড়া পর্যটক /[আমি ভঙ্গুর হে]। কী অদ্ভুত প্রশ্ন , কার কাছে ?

মলয় রায় চৌধুরী: কবিতায় প্রশ্নগুলো নিজেকেই। উত্তরটিই তো প্রশ্ন। প্রশ্নটিই তো উত্তর।

শৈলী প্রতিবেদক: একাকিত্ব মেনে নেওয়া নাকি বেছে নেওয়া ? কেমন লাগে ?

মলয় রায় চৌধুরী: বেছে নেওয়া। লাগালাগির ব্যাপার নয়। এ-এক অস্তিত্বের অবস্হান।

শৈলী প্রতিবেদক: নতুনদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন?

মলয় রায় চৌধুরী: বাংলা অক্ষর নেটে দেখতে পেলে আগ্রহ হয়। কী আর বলব নতুন করে। হ্যাঁ, আমার প্রবন্ধ পড়ো বলতে পারি।

গিনটিং হাইল্যান্ড যাবার পথে কেবল কারে

সিঙ্গাপুরে সমুদ্রের ধারে

স নে ট:
কু টু ম বা ড়ি

ঘুরেফিরে পাখি বসে এসে আঙিনায়
কূজনে কামনাগাঁথা উতলিত ক্ষণ
ফাগুনের ফুল ঝরে চৈতন্য খরায়
হাহাকারের আগুনে পোড়ে জমাধন
স্বপ্নকে বন্ধক রাখে রাড় মহাজন
চাঁদহীন রাতেরই ভাটিয়ালী গাই
অদৃশ্য চতুরবাণে কাঁপে তপোবন
সঙ্গমকান্ত তটিনী জাগে মোহনায়

হুট করে দেয় ছুট পায়ের শিকল
প্রপঞ্চ পাগলা টান করে বাড়াবাড়ি
শপথে পথের সাথে দৃষ্টি দোলাচল
টানাপড়েন মার্জিনে হয় ছাড়াছাড়ি
বেহারাবেহাগমাখা আঁখি ছলছল
নাভিশ্রী বাতাস ও রে যা কুটুমবাড়ি

রাজন্য রুহানি

নিজ:

হাঁটতে হাঁটতে মগজ হাতড়ে দেখি--- অভিসন্ধির মানচিত্র হারিয়ে গেছে কোথাও। শুধু মনে পড়ে বাবার কথা; ছয়চোরের ঘরে বন্দী পাখিটির চোখেই কেবল আকাশ দেখা যায়। প্রযত্নের প্রবঞ্চনা ছাড়া জানা নেই চোরদের স্থাবর সাকিন, কোনোদিন পাখিটিরও দেখা পাবো কি-না--- এ চিন্তায় সামনে-পিছনের সমান দ্বন্দ্বে নিত্যবৃত্ত ছন্দে ঘুরপাক খাচ্ছে বর্তমান। পাখিটির চোখে চোখ রাখার প্রাণান্ত ইচ্ছে জিওল দিয়েছি অথচ।

মুভি রিভিউ

তারেক মাসুদ-এর 'মাটির ময়না'

অতিথি শৈলার **আলম খোরশেদ**

> “কি বিষয়ভাবনায়, কি আঙ্গিক কল্পনায়, কি নির্মাণকৌশলে 'মাটির ময়না'র পরিচালক যে সুগভীর প্রজ্ঞা ও ইতিহাস-চেতনা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব, সর্বোপরি মৌলিকতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এক কথায় দুর্ল”

মুভি রিভিউ

বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, 'মুক্তির গান'-খ্যাত তারেক মাসুদের প্রথম কাহিনিচিত্র 'মাটির ময়না'। ছবিটি দেখার সুযোগ হয়েছিল গেল বছরের মন্ট্রিয়ল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। এটি তৈরির বাসনা ও প্রস্তুতি তার প্রায় এক যুগেরও অধিক কালের। তারেকের সঙ্গে পূর্ব-পরিচয়ের সূত্রে জানা ছিল যে নিজের কৈশোরকালীন মাদ্রাসা-জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই তিনি নির্মাণ করবেন তার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটি এবং সেই লক্ষ্যে তিনি ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন অনেকদিন ধরে। নয়ের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ মার্কিনদেশে প্রবাসজীবন সাঙ্গ করে তিনি দেশে ফিরে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন 'মুক্তির গান'-এর প্রায় সমাপ্ত একটি সংস্করণ যা অচিরকালের মধ্যেই মুক্তিযুদ্ধের প্রায় হারাতে বসা স্মৃতি ও ইতিহাসকে পুনরায় জনমানসে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলবে।

তারপর কোন্ ফাঁকে যে তিনি আযৌবন লালিত এই স্বপ্নের ছবিটি নির্মাণে হাত দিলেন, তার অতীতের দীর্ঘসূত্রতার সব বদনাম ঘুচিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ছবির কাজ সমাপ্ত করে একেবারে খোদ কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠিয়ে দিয়ে জিতে নিলেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিক অ্যাওয়ার্ড, সেটা জানতে পারি নি। গেলো গ্রীষ্মে ছবিটি দেখতে দেখতে গর্বে বুক ভরে উঠছিল এই ভেবে যে স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরে হলেও বাংলাদেশ থেকে এই প্রথম সত্যিকার ও সর্বার্থে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মিত হলো। কিছুদিন আগে মন্ট্রিয়লে বাণিজ্যিকভাবে এর মুক্তি উপলক্ষে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের জন্য আয়োজিত প্রদর্শনীতে দ্বিতীয়বারের মতো ছবিটি দেখে আরও একবার নিশ্চিত হই যে কান কতর্ৃপক্ষ রতন চিনতে ভুল করে নি আদৌ। কি বিষয়ভাবনায়, কি আঙ্গিক কল্পনায়, কি নির্মাণকৌশলে 'মাটির ময়না'র পরিচালক যে সুগভীর প্রজ্ঞা ও ইতিহাস-চেতনা, দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব, সর্বোপরি মৌলিকতা ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে এক কথায় দুর্লভ।

আলম খোরশেদ

পরিচালক, বিশদ বাঙলা, চট্টগ্রাম।

জন্ম
১৯৬০, কুমিল্লা।

যৌবনে আর সবার মতই কবিতা লিখতেন। এখন মূলত শিল্প ও সাহিত্য-সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন, পাশাপাশি অনুবাদ।

মৌলিক, অনুবাদ ও সম্পাদনা মিলিয়ে এ পর্যন্ত মোট সতেরোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।। *বিশদ সংবাদ* নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

purbapashchim@yahoo.com

মুভি রিভিউ

প্রথমেই আসা যাক বিষয়ভাবনায়। বর্তমানে সারা বিশ্বেই ইসলাম, মৌলবাদ, সন্ত্রাস্তএই বিষয়গুলোকে যেখানে ভীষণ একমাত্রিক, একপেশে, সাদাকালো ভাবে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা হচ্ছে তারেক মাসুদ সেখানে তার মাদ্রাসাজীবনের আভ্যন্তর অভিজ্ঞতা, পরবতর্ীকালে বাম রাজনীতি করার সুবাদে গণমানুষের সানি্নধ্য, বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে অর্জিত সুগভীর ইতিহাসজ্ঞান, সর্বোপরি শিল্পীর সংবেদনশীল বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির দৌলতে বিষয়টির অনেক গভীরে প্রবেশ করে তার বহুবিধ বর্ণচ্ছটাকে যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে তাকে অত্যন্ত মানবিক ও সামগ্রিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মোদ্দা কথা, তারেক তার এই ছবির ভিতর দিয়ে একাত্তর-পূর্ববতী বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি মর্মস্পশী মানবিক কাহিনীর আবরণে ইসলাম ধর্মকে ঘিরে যে প্রাণবন্ত আলোচনার অবতারণা করেন তা আজকের দিনের একটি জ্বলন্ত সমস্যার স্বরূপ অনুধাবন করতে সাহায্য করবে আমাদের।

তিনি একদিকে যেমন মাদ্রাসাশিক্ষার নির্মমতা ও মধ্যযুগীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে তুলে ধরেছেন তেমনি পাশাপাশি তার মধ্যেও যে এক অন্তর্লীন মানবিকতার ধারা প্রবহমাণ, এমনকি ইসলামের ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ভেতরেও যে বাহাস ও বিতর্ক বিদ্যমান তাকেও স্বীকৃতি দিতে ভোলেন নি। মোদ্দা কথা, তারেক তার এই ছবির ভিতর দিয়ে একাত্তর-পূর্ববতর্ী বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে একটি মর্মস্পশী মানবিক কাহিনীর আবরণে ইসলাম ধর্মকে ঘিরে যে প্রাণবন্ত আলোচনার অবতারণা করেন তা আজকের দিনের একটি জ্বলন্ত সমস্যার স্বরূপ অনুধাবন করতে সাহায্য করবে আমাদের।

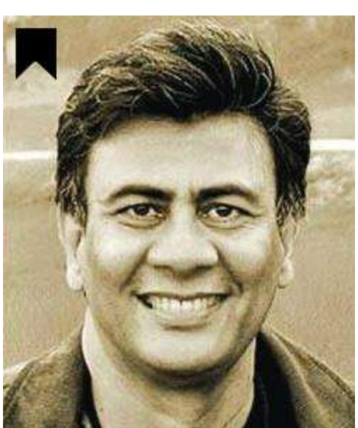

মুভি রিভিউ

মাটির ময়না' র একটি সিকুয়েন্স.........

সংলাপ নির্মাণেও তারেক বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন মাদ্রাসা শিক্ষকদের বয়ানে আরবি-ফার্সির সহজ, স্বছন্দ প্রয়োগ এবং আঞ্চলিক লোকজ ভাষার ব্যবহারে, যা এই ছবিটিকে অনেক বেশি মৃত্তিকাসংলগ্ন করে তুলেছে।

আর এই জটিল, সূক্ষ্ম, বহুমাত্রিক বিষয়টিকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে উপস্থাপন করার কাজে ক্যামেরা, কম্পোজিশন, সংলাপ আর সঙ্গীতকে ব্যবহার করেছেন তিনি অপূর্ব দক্ষতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে। বিশেষত মাদাসার দৃশ্যগুলোতে ক্যামেরার চোখে সুপরিকল্পিতভাবে আলো-অাঁধারিকে গুরুত্ব দিয়ে মাদ্রাসাজীবনের অজানা রহস্যকে তুলে আনায় বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। সংলাপ নির্মাণেও তারেক বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন মাদ্রাসা শিক্ষকদের বয়ানে আরবি-ফার্সির সহজ, স্বছন্দ প্রয়োগ এবং আঞ্চলিক লোকজ ভাষার ব্যবহারে, যা এই ছবিটিকে অনেক বেশি মৃত্তিকাসংলগ্ন করে তুলেছে। এই ছবিটির আরেকটি শক্তিশালী ও আকর্ষণীয় দিক এর সঙ্গীত। ছবির বক্তব্য প্রতিষ্ঠার কাজে পরিচালক সঙ্গীতকে ব্যবহার করেছেন প্রচুর ও প্রবলভাবে। লোকজ সুরে, বাউল ও দেহতত্ত্বের গানের আঙ্গিকে তিনি নিজেই গানগুলো রচনা করেছেন এবং এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় দুই ভক্তিগীতিশিল্পী মমতাজ ও ইব্রাহিম বয়াতিকে

মাটির ময়না' র পোস্টার

মাটির ময়না' র একটি আলোচিত দৃশ্য

দিয়ে সেগুলো গাইয়ে ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। কুশীলবদের কাছ থেকে অভিনয় আদায়ের কাজেও মোটামুটি সফল হয়েছেন তারেক, বিশেষত অপেশাদার শিল্পীদের তিনি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত কার্যকরভাবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় রোকন চরিত্রে অভিনয় করা টোকাই রাসেল ফারাজির কথা। রাসেল যে সহজ সপ্রতিভায় তার বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়-কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছে তা অনেক পাকা অভিনেতারও ঈর্ষার কারণ হবে। তবে সত্যের খাতিরে এখানে উল্লেখ করতে হয় যে অভিনয়াংশে সব অভিনেতাই সমান সাফল্য দেখাতে পারেন নি, যে কারণে ক্ষেত্রবিশেষে ছবিটিকে আড়ষ্ট মনে হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববতর্ী ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ও খোদ মুক্তিযুদ্ধকালীন দৃশ্যগুলোতে সেই আন্দোলনমুখর উন্মাতাল সময়ের মহাকাব্যিক মাত্রাটি পুরোপুরি ধরা পড়ে নি। ছবিটি দেখার পর সব প্রাপ্তি ও ভালোলাগার আড়ালে এইটুকু আক্ষেপ তাই থেকেই যায়। কিন্তু সব ছাপিয়ে তাদের এই অসাধারণ অর্জনের, বিশেষ করে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে বিশ্বের মানচিত্রে সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারেক, ক্যাথারিন আমাদের সকলেরই অপরিসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে থাকবেন।

মন্ট্রিয়ল, কানাডা
মে, ২০০৩

কথোপকথন

মি ডি য়া ম তা ম ত

শৈলী বাহক

কদিন আগে একটি ভয়াবহ দূর্ঘটনায় চিরতরে চলে গেলেন বাংলা চলচ্চিত্রের দুই প্রবাদ-প্রতিম কারিগর, তারেক মাসুদ এবং মিশুক মুনীর। এতে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল বাংলাদেশের। এ ব্যাপারে মতামতের জন্য আমরা কথা বলেছিলাম মিডিয়ার কয়েকজন কর্মীর সাথে। আসুন দেখা যাক তাদের এই মৃত্যুতে কে কি ভাবছেন।

শৈলী প্রতিবেদক: কেমন আছেন?

-এই তো বেশ ভালো

শৈলী প্রতিবেদক: এবারের ঈদে বিশেষ কোন প্ল্যান আছে?

- নাহ, তেমন কোন প্ল্যান নাই, নাটকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত

শৈলী প্রতিবেদক: তারেক মাসুদ এবং মিশুক মুনীরের মৃত্যুতে মিডিয়া কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে মনে করছেন্?

- এটা তো আসলে বলে বুঝানো যাবে না। আমরা সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা এর শূন্যতা বোধ করতে থাকব!

শৈলী প্রতিবেদক: এটাকে কি দূর্ঘটনা নাকি রাষ্ট্রিয় হত্যাকান্ড বলা উচিত?

কথোপকথন

-এটাকে অবশ্যই রাষ্ট্রিয় হত্যাকান্ড বলা যায়

শৈলী প্রতিবেদক: এ থেকে উত্তোরনের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া এই মুহূর্তে জরুরী বলে মনে করেন?

- অবশ্যই, এই ধরনের ঘটনায় আমি নিজেও যে কোন দিন মারা যেতে পারি! যতদ্রুত সম্ভব এ ধরনের ঘটনা মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী।

শৈলী প্রতিবেদক: কাদের এগিয়ে আসা উচিত আগে, জনগনের নাকি রাজনীতিবিদদের?

- জনগন আন্দোলন করবে, কিন্তু কাজ তো করতে হবে রাজনীতিবিদদের!

শৈলী প্রতিবেদক: সকল কাজই কি আমাদের দেশে আন্দোলন করে আদায় করে নিতে হবে? এগুলো তো রাজনীতিবিদদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে!

-আমরা তো দায়িত্বজ্ঞানহীন জাতি, আন্দোলন করেই আমাদের দাবী যুগে যুগে আদায় করে নিতে হয়েছে! ভবিষ্যতেও তাই করতে হবে!

শৈলী প্রতিবেদক: এদের মধ্যে কারো সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল?

- কাগজের ফুল এর প্রধান কাস্ট নিয়ে তারেক মাসুদ সাথে যোগাযোগ হচ্ছিল, কিন্তু কাজ হয়নি!

শৈলী প্রতিবেদক: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনাকেও।

আদনান ফারুক হিল্লোল

" আমরা তো দায়িত্বজ্ঞানহীন জাতি, আন্দোলন করেই আমাদের দাবী যুগে যুগে আদায় করে নিতে হয়েছে! ভবিষ্যতেও তাই করতে হবে! "

রওনক হাসান

শৈলী প্রতিবেদক: কেমন আছেন?

ভালো আছি

শৈলী প্রতিবেদক: এবারের ঈদে বিশেষ কোন প্ল্যান কি আছে?

ঈদে ঘুরতে যাব পাহারে।

শৈলী প্রতিবেদক: তারেক মাসুদ এবং মিশুক মুনীরের মৃত্যুতে মিডিয়া কতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে মনে করছেন্?

আমি এতে কুবই হতাশ, এমন দুজন মানুষ এভাবে চলে যাবে সেটা অবিশ্বাস্য। আমাদের ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল এতে।

শৈলী প্রতিবেদক: এটাকে কি দূর্ঘটনা নাকি রাষ্ট্রিয় হত্যাকান্ড বলা উচিত?

দুর্ঘটনাই বলি

কথোপকথন

শৈলী প্রতিবেদক: এ থেকে উত্তোরনের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া এই মুহূর্তে জরুরী বলে মনে করেন?

উত্তোরনের উপায় শুধু রাষ্ট্র খুজলেই হবে না। আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। রাষ্ট্র যদি উদ্যোগ নেয়ও, আমরা সচেতন না হলে কোনদিনই কিছু হবে না! জাতিগতভাবে আমরা খুবই খেয়ালী, দায়িত্বজ্ঞানহীন। যেমন ধরুন, রোজ রাস্তায় দেখবেন হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক, বৃদ্ধ, তারা জেনেশুনে ফুটওভার ব্যবহার না করে যেখান সেখান দিয়া রাস্তা পার হচ্ছে। তো কি হল, এত বড় ঘটনা ঘটল, তবুও সবাই নির্বিকার। রাষ্ট্রকেও যেমন কঠোর হতে হবে এ ব্যাপারে তেমনি মানুষকেও সচেতন হতে হবে। আমরাই যেন আমাদের বিপদ ডেকে না আনি।

শৈলী প্রতিবেদক: কাদের এগিয়ে আসা উচিত আগে, জনগনের নাকি রাজনীতিবিদদের?

সবাইকেই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে্ নেতারা যদি না আসে জনগন কে জনগনকে একতাবদ্ধ হয়ে ওদেরকে আসতে বাধ্য করতে হবে।

শৈলী প্রতিবেদক: এদের মধ্যে কারো সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল? থাকলে কিভাবে?

না, ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না। কাজ দিয়েই আমি তাদেরকে জানতাম।

শৈলী প্রতিবেদক: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

রওনক হাসান

"এত বড় ঘটনা ঘটল, তবুও সবাই নির্বিকার। রাষ্ট্রকেও যেমন কঠোর হতে হবে এ ব্যাপারে তেমনি মানুষকেও সচেতন হতে হবে। আমরাই যেন আমাদের বিপদ ডেকে না আনি"

চলচ্চিত্রকার খিজির হায়াত খানের সাথে কথোপকথন

শৈলী বাহক

শৈলী প্রতিবেদক: কেমন আছেন?

I am doing aright,

Sad frustrated and living like a wounded soul far away from home. Why coming later in this email.

Currently I am doing my Masters in Digital Media at Simon Fraser University's Great Northern Way Campus at Vancouver, Canada.

শৈলী প্রতিবেদক: আমরা জানি যে, আপনি "জাগো" ছবির মাধ্যমে এখন দর্শক সমাজে অনেক সমাদৃত। ছবির পরিকল্পনা সময় অর্থাৎ প্ল্যানিং প্লাটফরম সম্বন্ধে একটু বলুন?

I finally could convince the owner and chairman Sharjeel Karim that it is possible to dare to dream and make a film in Bangladesh about football and rest is history.

বি:দ্র: সাক্ষাতকারটি স্ব স্ব ভাষায় হুবুহু তুলে ধরা হল!

শুটিংয়ের ফাকে

Regarding Jaago, I always wanted to make a sports film in Bangladesh. After my first feature film Astittey Amar Desh I was looking for the right story. I finally found a theme, which was related to football, and I started doing my research on it. I thought it would be interesting if I could make a film on Shadheen Bangla Football Dal who raised awareness and money for our freedom fighters during 1971 playing 16 matches all over India. Unfortunately the financial limitation and difficulty of shooting in India forced me to come up with a refined version of the story and based on the theme I wrote Jaago, which is inspired and dedicated to Shadheen Bangla Football team. It took me almost a year to write the script and than started the hard part finding a right producer who will finance the film. I went to everywhere and approached everybody and trust me I mean everybody including all the telecoms but nobody came forward and all of them gave different reasons for that. Finally through a friend of mine I got a chance to pitch the idea to Interspeed which is the oldest marketing agency in Bangladesh. After trying 6 months there I finally could convince the owner and chairman Sharjeel Karim that it is possible to dare to dream and make a film in Bangladesh about football and rest is history.

শৈলী প্রতিবেদক: বাংলাদেশের ফুটবল বা ক্রীড়াকে বেজ করে এটাই বাংলাদেশের প্রথম ছবি। এমন একটি ভিন্ন বিষয় নিয়ে আগে কেউ চলচ্চিত্র বানানোর সাহস করে নি। নাচ-গানে ভরপুর দর্শক আকৃষ্ট করে এমন বিষয় নিয়ে সকল পরিচালকই ছবি করতে আগ্রহী। এ বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখবেন?

Regarding Bangladesh Film Industry and why the directors are not taking the risk of making this kind of films. Well that is a long and complicated story but I would like to keep it simple. First of all we have to look at our film going audience. Right now the only class who goes to cinema halls are the lower class not even lower middle class except the 2 or 3 cinema halls in Dhaka and I will not count those cause those numbers are pretty small. The class who goes to watch the movies, they want cheap entertainment and its very easy to please them with the so called Nache Ganne vorpur Sakib khan films. Those people who are making their livelihood as filmmakers in Bangladesh tries not to take the risk as with the current infrastructures does promise any good return if otherwise. Its not that our directors don′t want to try new things but they are afraid and even if they are ready to take the risk they don′t get the necessary finance to make the films. It′s a cycle and until and unless this cycle is broken nothing will happen to Bangaldesh Industry. One Monpura or One Jaago will not do anything to keep this industry alive unless we make some solid policy changes and implement those. I will talk about it in later part of my answers.

জাগো চলচ্চিত্রের
একটি বিশেষ মুহূর্ত

জাগো চলচ্চিত্রের
একটি বিশেষ মুহূর্ত

শৈলী প্রতিবেদক: বাংলাদেশে এ বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মোনে টেকনিকেল অথাৎ করিগরি কোন বিষয়ে কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

As you probably know we have shot the entire film in High Definition and later transferred it to 35mm to project in the cinema halls. It was a very new concept when we made the film and everybody was looking towards us for test and trial and test and trail it was. Since it was never been done before in such a large scale we had to go through lots of technical glitches. On top of that we did not have the right technicians, some of them even over sold themselves and later we found out they can't do the things which they have promised before. At the end it all worked out as the team really worked hard. We spend a lot of money in test and trial and the postproduction in India (Hydrabad and Mumbai) was expensive. You have to understand we had 2 matches in the film with almost 40 minutes of screen time and we had 6 HD cameras shooting in 180 degree angels and as a result had huge amount of raw footage. Managing those footage and use those later on in the film was a huge challenge. It took us a year and half to finish the postproduction and we shot the film in 1 year so in total Jaago was made in 2 and half years of time. Today HD workflow is the most preferred workflow to the new generation of film makers in Bangladesh and I am glad Jaago made that possible at the beginning and the culprits of FDC can no longer create complication while making the film but they still can in the distribution process.

জাগো চলচ্চিত্রের
শুটিং দৃশ্য

বি:দ্র: সাক্ষাতকারটি স্ব স্ব ভাষায় হুবুহু তুলে ধরা হল!

কথোপকথন

শৈলী প্রতিবেদক: আমরা জানি যে আপনি বর্তমানে কানাডার এটি বিশ্ববিদ্যালযে চলচ্চিত্র বিষয়ক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন। একটি সৃজনশীল কাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কতটুকু প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন? কানাডায় চলচ্চিত্র বিষয়ক উচ্চশিক্ষার মান সম্বন্ধে কিছু কি বলবেন?

Regarding the importance of education in film and media: Though to me the most important thing for making a film is passion but I believe education is absolutely necessary in todays film making world. The reason I say that is today's film industry all over the world is driven by technology and which is changing everyday so until and unless you have a solid understanding of how the whole workflow will work it is difficult to survive. Filmmaking is a very competitive art and in order to be successful one has to have knowledge of everything related to that. Sure someone can learn that by himself and from hands on experiences (like I did) but I would not recommend that. Life would have been much easier for me if I had proper film education, which I did not have, and I had to learn it the hard way. So yes I believe the necessity of film education is very important.

শৈলী প্রতিবেদক: বাংলাদেশের বর্তমান মূলধারার মান সম্বন্ধে কি আপনি কিছু বলবেন? বর্তমান মূলধারার চলচ্চিত্রের মান বর্ধনের জন্য এফ ডি সি-র কি কি পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে আপনার ধারনা? টেকনিকেল কোন সীমাবদ্ধতা কি খুব বড় কারন বলে মনে করেন এক্ষেত্রে?

Regarding Bangladesh current film industry: In one ward if I have to describe Bangladesh film industry that would be DEAD. It's a dead film industry and until and unless we change the FDC 100% in every way nothing will happen. It's a total mess and everybody including the government, policy makers, those who are involve in this art (directors, producers and technicians), and the viewers all are responsible for this mess. You have to remember one Channel I or one Mr. Sagor cannot change the industry. We need a holistic approach and it has to start from the government policy making to change this industry. We have 160 million people and our film industry in dying everyday; it is a shame to our nation. Unfortunately no body cares. Here and there some people try to make a good film and most of them do not end up making money including Jaago and the whole initiative dies. At the end some just leave the profession and some like me leave the dam country in pain and frustration. We need to change the FDC and the total film culture in Bangladesh and if the government can's they should let it be privatized like India. Days are not too far when we will not have even 100 cinema halls in Bangladesh, I think the current number of running cinema halls are only around 400.

শৈলী প্রতিবেদক: জাগো চলচ্চিত্রের নির্মান মুহূর্তে কোন মজার ঘটনা?

I have lots of memories in Jaago some are good but most of them are bad cause it was really a hard project to make and lot of people tried to ruin it but I walked away wit the good memories and locked the bad ones with some critical notes in my locker. I would say the most funny part was the entire crew were so worried about the shooting of the game part which we did at the end of the film and we thought that will be the hardest part. Hard it was but we shot it very quickly and with not too much chaos. I guess since we all were too worried about it we also put lots of time analyzing the whole shooting plan and at the end it all went well with some small incidents here and there. My entire crew worked so hard and all credit goes to them.

শৈলী প্রতিবেদক: আমাদের দেশের অভিনয়শিল্পী এবং কলাকুশলী কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে পারছে?

About the actors and technicians: From my experiences we have a very dedicated crews in Bangladesh film and media industry who works really hard and who are very talented despite their limitations in knowledge and resources. I was very shocked regarding the unprofessional behavior of our artists. Sorry to say the actor and actresses in Bangladesh are probably the most unprofessional you will ever find. They are always so packed up with schedule that they have no time to think about a particular character and now with new style of improvising scripts you don't need any training. Anybody and everybody is an actor. These attitudes needs to change otherwise trust time are not too far when people will start not watching our dramas the way they are ignoring our films. Through in general the film artists are better than the TV media industry. The artist's professionalism at the TV media industry sucks big time. Again the entire industry needs to change their holistic approach if we want to go further and compete in the global platform.

শৈলী প্রতিবেদক: বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র আশানুরূপ অবস্থান থেকে অনেক নিম্নগামী। এর কারন কি বলে আপনি মনে করেন? এ থেকে উত্তোরনের জন্য আপনার ভাবনা কি?

I guess I have already talked about the quality of our films; we have no chance comparing ours with the world film industry. Until and unless we change our policy and reshuffle the entire industry from scratch it is bound to shut down. Our distribution is a place where we will find the most ignorant and corrupt people, FDC is ruled by people who are not welcoming the new generation and new age of film making and day by day people are getting far away from our culture and our films. Government needs to take strong policies regarding restoring the image of our films and have to come up with the right and tough decisions to implement those. Unfortunately they are so busy fighting to manage the basic necessities for the mass that film or cinema is not even existed in their list of priorities. No wonder there was nothing for the film industry when this current government presented their over promised Digital Bangladesh concept.

শৈলী প্রতিবেদক: আপনার নতুন কোন চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা আছে কি? -- মূলধারার চলচ্চিত্র নির্মানে আগ্রহ কতটুকু?

I am a filmmaker or at least I would like to die as a filmmaker and I certainly have plans to keep on making films. I am not sure whether I will be making films for Bangladesh industry in my recent coming future. Someday if I feel that yes the industry has changed and it is worthed to take the risk I will go back again. Untill and unless sorry to say I am out of Bangladesh film Industry cause it does not make any sense fighting a loosing battle where everything is against good films. I am not one of those who would like to put flowers in his own memorial. I tried my best to do something, don't know how successful I was but there was no dishonestly in my efforts and at the end I found out it all went in vain. I feel sorry and sad when I look back and think about it but I guess that is the reality of our industry today. I hope and pray that things will change and Bangladesh cinema will not be a property of FDC people or a particular TV channel in future.

জাগো চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্ত

কথোপকথন

Cinema is the reflection of a nation and its culture and we have to remember that. We had a glorious past and we should take inspiration from that. There should be a separate ministry if required to boost the film industry. We are sitting on a gold mine of 160 million people and we can make this a very commercially successful venture for our country's economy and right next india and its multiple successful film industries are the biggest example of that. Before it is too late we have to do something but unfortunately that will not happen and that is the unpleasant truth. Sorry that I was so negative with my answers but the experiences I had back home was something I have never imagined in my wildest dream. Feel free to contact me if you need more information. All the best with everything and let me know when it is published online.

শৈলী প্রতিবেদক: অনেক শুভকামনা আপনাকে। ভালো থাকুন।

Best wishes for Shoily. Thank you too!

জাগো চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ মুহূর্ত

কাওসারের কার্টুন

কাওসার মাহমুদ

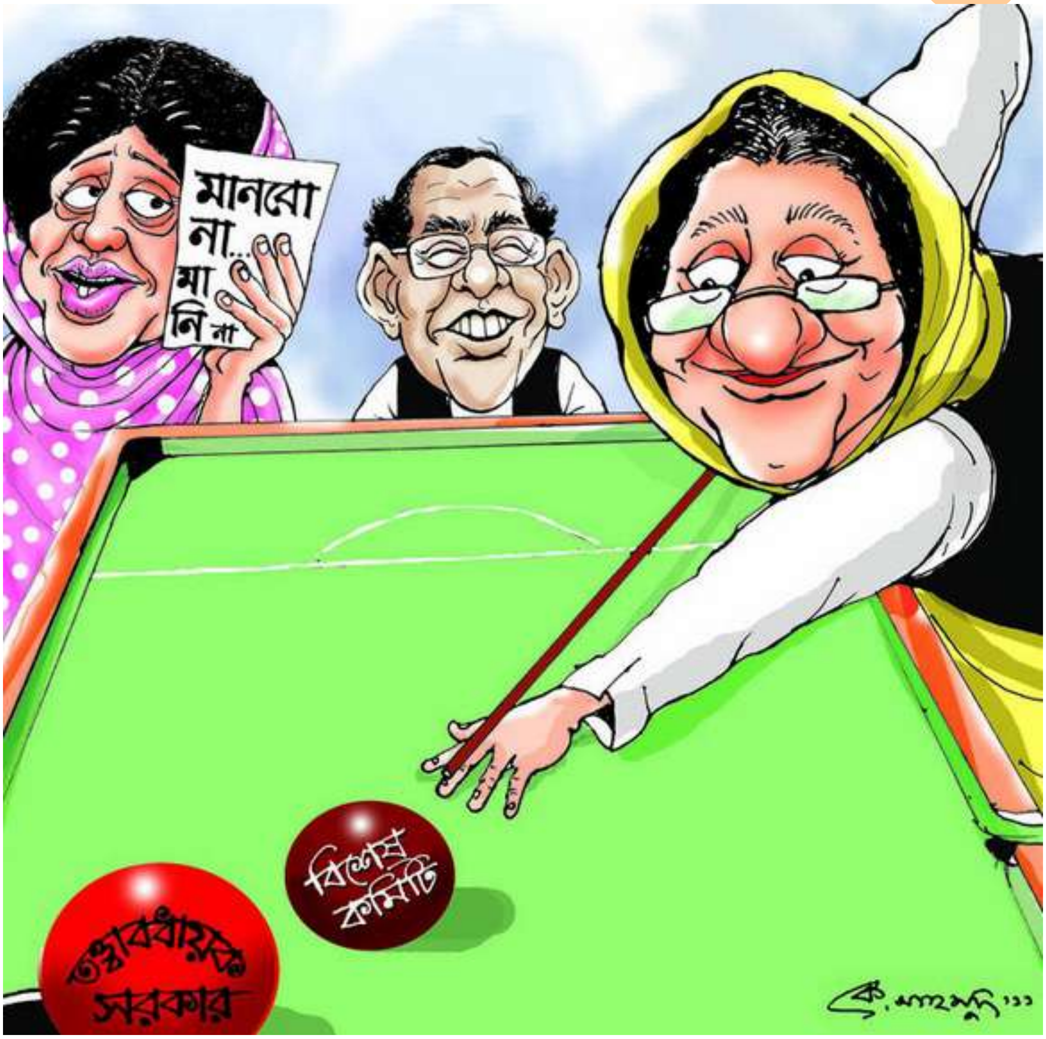
মানবো না...
মা
নি না
বিশেষ কমিটি
তত্ত্বাবধায়ক সরকার

হরতাল সমর্থন সমগ্র
আন্দোলন ও হরতাল কৌশল
হরতাল স্পেশাল স্যুপ!

রাজধানীতে পানি সংকট ।
মানি না...আমার দরকার পানি...

তোর আর তোর স্ত্রীর বিয়ে কী কোন ম্যারেজ ব্যুরোর মাধ্যমে হয়েছিল...?
না নিজেরা নিজেরা ঠিক করেছিলাম... শুধু শুধু ম্যারেজ ব্যুরোকে দোষ দিয়ে লাভ কি....

সম্বোধনহীন

অতিথি সানজিদা শাহরিয়ার

"......আমি জানি মাম্মা কত কষ্ট করে। আমাদের ৪ ভাই বোনকে আগের মত রাখতে পারে না বলে কষ্টটা ঢেকে রাখে। শুধু মধ্যরাতে ঘুম ভাংলে দেখি মাম্মা মুরতির মত বারান্দায় বসে আছে। আমরা শহরের একটা নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তাম। বাবা আর পড়বার টাকা দেবে না দেখে মাম্মা আমাদের একে একে বাংলা মিডিয়ামে নিয়ে আসছে। এখানে নাকি কম খরচে পড়া যায়। খাবার টেবিলে তরকারী কিম্বা রেস্টুরেন্টে খাওয়া কমে গেছে, সেই দামী গাড়ীটাও আর নেই......"

উপর থেকে জে.ার করে চোখটা সরিয়ে ঘরের চার পাশে চোখ বুলালাম। নিচে একটা প্লাস্টিকের মোড়া উলটানো। দেয়ালে বুক সেলফ, পাশে পড়ার টেবিল। হঠাত বই এর তলে চোখ আটকে গেল। বারবির ছবিওয়ালা গোলাপি ডাইরির কোনা দেখা যাচ্ছে। হাতে নিয়ে দেখি আজকের লেখা। সম্বোধনহীন।

আজ আমাকে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তী করতে যখন মাম্মা নিয়ে যাচ্ছিইল কেমন জানি দমটা বন্ধ হয়ে আসছিল। আমাদের বিদেশী প্রিন্সিপালের পাশে বাংলা মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপালকে কেমন জানি বেখাপ্পা লাগছিল। কিন্তু মাম্মাকে কিছুই বুঝতে দেই নাই। আমি জানি মাম্মা কত কষ্ট করে। আমাদের ৪ ভাই বোনকে আগের মত রাখতে পারে না বলে কষ্টটা ঢেকে রাখে।

সানজিদা শাহরিয়া

সহযোগী অধ্যাবপক

বর্তমান অবস্থান: ঢাকা, বাংলাদেশ

শুধু মধ্যরাতে ঘুম ভাংলে দেখি মাম্মা মুরতির মত বারান্দায় বসে আছে। আমরা শহরের একটা নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তাম। বাবা আর পড়বার টাকা দেবে না দেখে মাম্মা আমাদের একে একে বাংলা মিডিয়ামে নিয়ে আসছে। এখানে নাকি কম খরচে পড়া যায়। খাবার টেবিলে তরকারী কিম্বা রেস্টুরেন্টে খাওয়া কমে গেছে, সেই দামী গাড়ীটাও আর নেই, কিন্তু যেটা কমে নাই সেটা মাম্মার আদর। আমরা নানা বাড়িতে এসে উঠেছি। কোণো জ.ণ্নদিনের দাওয়াতে বাচ্চারা যখন বাবার হাত ধরে ছবি তোলে তখন আমরা ৪ ভাইবোন পলকে চুপ করে যাই। আবার রাতে যখন অনেক জোরে কম্পুটারে মাম্মা আর আমরা ৪ ভাইবোন নাচি তখন অকারনে আমরা একে অন্যের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ি। আজকে স্কুল থেকে ফিরবার পথে দেখি মান্নান আঙ্কেলের সেই বড় গাড়ীটা। বাবা আর তার পাশে সেই আন্টিটা যার নাম রিদি। ওরা খুব হাসছিল। আমাদেরকে দেখে নাই। হুশ করে গাড়ীটা আমাদের পাশ কাটিয়ে গেল। মাম্মার মুখটা পলকে কেমন যেন সাদা হয়ে গেল। আর একটু হলে সাইকেলের নিচে পড়ত। আমিই হাত টেনে সরিয়ে নিলাম। না একটা রিকশা না কিছু পাওয়া গেল। সেই কতো দূর রাস্তা ঠেংগিয়ে সেই বাস ধরা। আগে আমরা সিএনজিতে ওঠার কথা ভাবতেই পারতাম না, আর এখন এত ভাড়া বেশি বলে আমরা সিএনজিতে চড়তেই পারি না। অনেকখন হচ্ছে মাম্মার কোন সাড়াশব্দ নেই !!! ডিয়ার ডাইরি একটু দাড়াও!দেখি কি হল ....' বাস আর কিছু নাই। মাথার পুলিশী টুপিটা খুলে দীরঘশাস ফেলে আমি আবার ওপরে তাকালাম, সেখানে জিম্নাস্টিক রিং-এ মা ও মেয়ের ২ টা ঠান্ডা শরীর ২টা রিং-এ পাশাপাশি ঝুলছে...।

আড্ডা

শৈলার শৈলী বাহক

শৈলী অনলাইন আড্ডা

শৈলী "অনলাইন আড্ডা" নামে বিশেষ বিভাগ আছে। শৈলী অনলাইন আড্ডায় সমকালীন কোন বিষয় নিয়ে সকল সম্মানিত শৈলার এবং সুপ্রিয় পাঠকদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। অনলাইন বৈঠকে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন। শর্তস্বরূপ বাংলা ভাষায় লেখা প্রতিক্রিয়াই শুধু গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি আড্ডায় অংশগ্রহনকারীদের নাম সংশ্লিষ্ট পোস্টে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। শৈলী ঈদ-সংখ্যায় শৈলী আড্ডা-১ এর চুম্বক অংশটুকু এখানে উপস্তাপন করা হল

আড্ডা

শৈলী "অনলাইন আড্ডা-১" এর বিষয়:

" রবীন্দ্র এবং নজরুল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য বিশ্বদরবারে উল্লেখযোগ্য স্থান করতে না পারার কারন হিসেবে আপনি কি মনে করেন? "

শৈলীর এই আড্ডায় অংশগ্রহন করেছেন:

১. জুলিয়ান সিদ্দিকী
২. শৈবাল
৩. মুরাদুল ইসলাম
৪. নীল নক্ষত্র

জুলিয়ান সিদ্দিকী

বিশ্ব-দরবারে বাংলা সাহিত্য উল্লেখযোগ্যস্থান তৈরী করতে না পারা কারণ হচ্ছে আমাদের বাঙালী মানসিকতা এবং সাম্প্রদায়ীকতা। বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হবে। এস প্রসঙ্গে নানা তথ্যসূত্রেরও আগমন ঘটবে। যা হয়তো আলোচনাকে খানকটা বাধাগ্রস্থ করে তুলতে পারে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়েছে একজন হিন্দু লেখক তার লেখায় নিজ ধর্ম আর সম্প্রদায়কে যেমন প্রাধান্য দিতে পছন্দই কেবল করেন না অন্তর্গত এক ধরনের একগুঁয়েমীকেও পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন না তেমনি মুসলিম লেখকও একই দোষে দুষ্ট।

নীল নক্ষত্র

বাঙ্গালির মুখ যত চলে কলম তত চলতে চায় না কেন?
চায়ের টেবিলে ঝর উইঠা যায়, হাতাহাতি, মারামারি, রক্তারক্তি সব কিছু খুব জোড়ের সাথে চলে কিন্তু কাগজ সাদা পইরা থাকে কলমের কালি জইমা যায় নাইলে শুকাইয়া যায় তাও কাগজে একটা দাগ পরে না কেন?
জবাব চাই।

আড্ডা

শৈবাল

ঠিক , আমার মনে হয় তাই । সাম্প্রদায়িকতার চেয়েও বড় কিছুতে সম্পর্ক সাযুজ্যের অভাব আছে ! হতে পারে তা সৌহার্দ্যের সম্মানের সংঘর্ষের কারণে ।
প্রথমে প্রথম থেকে বলি ;একটা উদাহরণ দিয়ে । রবীন্দ্র ছায়া থেকে স্বতন্ত্র কবি যেমন বুদ্ধদেব বসু অগ্রজ কবি ঠাকুরের যেমন সমালোচনা করেছেন তেমনি অপ্রধান কবিদেরও নেড়েছেন দীপ্ত দৃপ্ত সাহসী উচ্চারণে । তাতে কিন্তু সমালোচনা হয়েছে তীকন্দ বিশ্লেষণে আর সম্মান দেখিয়ে ।তেমনি কবি ঠাকুর তাকেঁ স্বাগত জানিয়েছেন উদার ভাবে , বুদ্ধদেব নিয়ে তিনি লিখেছেন " যে লেখা কয়টি দেখলুম তার সমস্তগুলি নিয়ে মনে হোলো এ যেন একটি দ্বীপ । এই দ্বীপের বিশেষ একটি আবহাওয়া ফলফুল ধ্বনি ও বর্ণ । এই সরস উর্বরতার বিশেষ একটি সীমার মধ্য এক জাতীয় বেদনার উপনিবেশ । দ্বীপটি সুন্দর কিন্তু নিভৃত । হয়তো ক্রমেই দেখা যাবে দ্বীপপুঞ্জ হয়তো প্রকাশ পাবে উদার বিচিত্র মহাদ্বীপে তমালতালী বনরাজিনীলা তটরেখা " ।

জুলিয়ান সিদ্দিকী

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী যেমন করে উঠে এসেছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তেমনটা আর কোনো লেখকের হাত দিয়ে সৃষ্টি হয়নি। আরকটা দিক হলো বাঙালীর ইংরেজির প্রতি অনীহা। বাংলা সাহিত্যকে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে আনার প্রতি আলস্যও কাজ করে থাকতে পারে। আরেকটা দিক হচ্ছে আমাদের বড় লেখকরা যাই লিখছেন তা হয়তো সাহিত্য মানের দিক দিয়ে উচ্চমানে পৌঁছুতে পারছে না। যে কারণে বাংলা থেকে ভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হলেও কারো দৃষ্টি আকর্ষন করতে বা ভিন্ন ভাষার পাঠকের মন ছুঁয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছে।

মুরাদুল ইসলাম

বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার আগে পাকিস্তানের অংশ হিসাবে ছিল।তখন ওই পাকি শাসকরা খালি যে অর্থনৈতিক শোষন করছে এইটা না।তারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শোষন কম করে নাই।বাংলা ভাষাকে বলা হইত হিন্দুদের ভাষা,বাঙালী সংস্কৃতিকে বাবুদের কালচার।এমনকি বাঙালী মুসলমানদের বলা হইত হিন্দুদের জারজ সন্তান।

শুধু চাই আমার উপবাসীরে

আমি ছন্নছাড়া এক স্বপ্ন ভুক মানুষ,
খুঁজে ফিরছি শুধু
মৃত্তিকার জন্মের গুহা; যেখানে আমার
পূর্বপুরুষেরা বাস করেছিল!
নন্দন চর্যা মেখে,
তীর ধনুকের ফলায় গেঁথেছিল আমার স্বপ্ন
শিকারের রক্ত লীলায়।

সময়ের পৈশাচিক উল্লাসের গর্জন,
আমার হৃদপিণ্ডের রক্ত ঝরায়
কর্ণ কুহরে হাতের তালু চেপে; এ এক
নিষ্প্রভ বিলাপ
আমি মুক্তি পেতে উবু হয়ে,
হাটু গেড়ে বসে পড়ি মৃত্তিকার গুহায়।

অষ্টাদশী আলিঙ্গনে,
সঁপিবো জীবন হে মৃত্তিকা তোমার পদতলে
শুধু চাই আমার উপবাসীরে; দু'জনে মিলে
কর্ষণে মৃত্তিকা তোমায়
উর্বর ভূষণে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা।

১৪১৭@২১ ফাল্গুন,বসন্তকাল!

চারু মান্নান

নিজ পরিচিতি

আমি একজন সাধারণ ব্লগার-চারুমান্নান। কবিতার মায়া জালে, আকণ্ঠ নিমজ্জিত !

মোঃ আব্দুল মান্নান
২৯/ডি,পূর্ব রাজাবাজার,তেজগাঁও,ঢাকা-১২১৫

++৮৮০২-০১৯১২২৪১২৩৫

ই-মেইল-Charu.Mannan@gmx.com

রন্ধন শৈলী

নাড়ুর বাসনা

উপদেষ্টা শৈলার তুষার গায়েন

"পূজোর দিনে নাড়ু খাইবার বাসনা প্রবল হইয়াছে। এই প্রবাসে, একাকী জীবনে, কে আছে যে নাড়ু বানাইয়া খাওয়াইবে? এখানেও পূজো হয়, বঙ্গ ললনারা বহুবর্ণ শাড়ী পরিধানে অঞ্চল উড়াইয়া রুপে-গন্ধে-বর্ণে মণ্ডপ প্রজ্জ্বলিত করিতে আসেন; তাহাদের হাসি ও চকিত চাহনীর অভ্যন্তরে দেবী দর্শন ঘটে, ধূপ-ধুনা ও বাদ্যের নিশ্চেতন করা স্মৃতিচারিতার ভিতর কদাচিৎ কিছু প্রসাদও জুটিয়া যায়। তাই বলিয়া নাড়ু? তাহা যে দূরধিগম্য, কেবলই করতল হইতে তৈলযুক্ত নারিকেল মিষ্টতার সুগন্ধ অতীত হইতে উদ্ভাসিত হইয়া আবার দূরে মিলাইয়া যায়! সাদা, বাদামী, কালো নাড়ুর গন্ধে মন আমার উচাটন হইয়াছে। নারিকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু ... কত না সেই নাড়ুর রুপ, খাইবার থেকেও দেখিতে ও ঘ্রাণ পাইতে কম আনন্দ ছিল না। দেশে থাকিতে যখন মাতা বাঁচিয়া ছিলেন, পূজা শুরু হইতে না হইতেই তিনি নাড়ু পাকাইতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র, মানে ভবদীয় লেখক বিশিষ্ট ভোজনরসিক জানিয়া মাতা সর্বদাই তাঁহার হস্তে পাকানো প্রথম নাড়ুর আস্বাদন আমাকেই করিতে দিতেন। সেই নাড়ুর স্বাদে ও গন্ধে আমার কবিতার লাবন্য কি কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই? কিন্তু, হায়! মাতাও গত হইয়াছেন, আমিও দেশে নাই; কি আর করা, নাড়ুর স্মৃতি লইয়াই দিন যাপন করিতে হইতেছে।"

শাস্ত্রে বলে, গতস্য শোচনা নাস্তি।

বৈ শা খী

১-বৈশাখী

ও সখী আয়রে তোরা
আয়রে সবাই বরণ করি
নতুন বৈশাখী
সে যে ফুল ফসলে ভরাবে
এই সোনার ধরণী।
গত বছর ফেলে আসা
রাঙা পথে চরণ ফেলে
চুপি চুপি এলো আজ
লাজুক নয়ন মেলে
ও ভাই চমকে উঠি দেখে
তাহার সুখের লাবনী।
বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে তারে
গান শোনাব দাওয়ায় বসে
বসতে সবাই দে না তারে
বাংলা মায়ের কোলে
ও ভাই উড়িয়ে পাল আজ
ভাসবে গাঙে সুখের তরণি।

২-বৈশাখ বরণ

সোনালী ডানা মেলে
পুষপ রথে উড়ে
আজ বৈশাখ এলো দ্বারে।
মুছে দিয়ে বেদনা কান্না
খর তাপ দহনে

খালিদ ওমর

পেশা: ব্যবসা

বর্তমান অবস্থান: নিউ ক্যাসেল, ইউকে।

প্রিয় উক্তি: সুন্দরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, আর বুঝতে চেষ্টা করি মানুষের কুয়াশা ঢাকা জটিল মন।

গ্লানি দুঃখ অভিশাপ
যা ছিল মনে
সেই স্মৃতি গেল ঝরে।
দেখা দিল রঙিন স্বপ্ন
সুন্দর সকালে
মধুর সুরে
মনের কথা বলতে
সুখের বারতা এলো ঘরে।

৩-সোনালী আহবান

বরষ পরে আবার এসেছ বৈশাখ
সোনার তরী বেয়ে
স্বাগতম, স্বাগতম হে নতুন
তোমায় বরণ করি ভালবেসে।।
প্রভাতী তারার মালা গলায় পরে
সুখের পায়রা হয়ে চঞ্চল পায়ে
এনেছ আবার দুরন্ত মৌসুমি ঝড়
কাঠ ফাটা তৃষা
চাতকীর চেয়ে থাকা আকাশে।।
মেঘে মেঘে ঢালো বারিধারা
সাজাতে সুখের ধরণি
হৃদয়ে সঞ্চারো আশা
দ্বীপ জ্বালো সোনার বরণি।
শূন্যতার অভিশাপ করে উন্মোচন
এসো আবার নতুন করে
ফুলে ফুলে ভরে দাও তৃষিত ভাল
মুছে দাও বেদনা কান্না
তোমার মধুর আহ্বানে

৪-কোন একদিন

শতেক বছর পরে দেশে গাও গেরাম আর
থাকবে না বৌ কথা কও সুরে পাখী সকাল
সাঁঝে ডাকবে না। বিজলী বাতি কেড়ে নিবে
চাঁদের হাসি তারার মেলা কলসি কাঁখে জল
ভরিতে আসবে না আর পল্লী বালা, মাটির
প্রদীপ জ্বেলে কেহ পথ চেয়ে আর থাকবে
না।

লতায় ঘেরা সবুজ বনে ছোট্ট পাখী হলদে
ফুল
ঝিলের জলে শাপলা শালুক শান্ত দিঘী নদীর
কুল,
থাকবে সবই এই দেশেতে চোখ মেলে কেউ
দেখবে না।

রো দ বি ক্রে তা

উতসর্গ : আমার শব্দশূন্য দিনের সঙ্গী আবারও হুতুম

ছায়া ছায়া আবছায়া মাঝ দুপুর করে শহরে
ভারি রঙে চেনা সঙ খসা পলেস্তারা ঢাকা রঙ
ঢেকে রাখা জলরঙ, জানো তো কতোখানি লবণ ,
পুরোন শ্লোগান কানে স্যাঁতস্যাঁতে সুরে ঘুম আনে
ট্রাফিক জ্যামে জমে বিয়ন্ত ব্যস্ততা
পাঁজরে পাঁজা অরণ্য , পাতা চাপা পাংশুটে হলুদ
জংধরা কলকব্জা এক একটা বৃদ্ধ জাহাজ
লাল সিগন্যালে থামো , থামো ! শহর যেখানে
আছো

আর কতো বাড়বে , না !
জেনো ঈশ্বরকে ছোঁয়া যায় না ,
এবার বরং রোদ খোঁজ নির্বাসিত অভিমানী রোদ
যাদের আসা যাওয়া নিয়মিত ছিল জানালায়
আজ ব্যারিকেড বাঁধে বহুতল ডেভলাপগুলো
অঘ্রাত রোদ চুপটি মেরেছে কানা গলিঘুঁজিতে
আমিও ফিরেছি কতো রোদ্দুরের গন্ধ শুঁকে শুঁকে ।

আজ জমিয়েছি কিছু রোদ্দুর তাজা রঙ রোদ্দুর
স্বভাব শহরে মেয়ে তুমিও তো বেশ আনকোরা
শুকনো ঋতুতে রোদে ভেজার ইচ্ছে নাও থাকতে
পারে তাও যদি ইচ্ছে হয় এসো , আমার মুঠো
জমানো রোদ এক মুঠো রোদ জ্যান্ত রোদ , বিক্রি
করবো তোমার জন্যে

এক মুঠো রোদ এক ফোঁটা নোনতা জলের দামে
আমি শহরের একমাত্র সুলভ রোদ বিক্রেতা ।

[রোদ বিক্রেতা / শৈবাল কায়েস]

শৈবাল

আমি ভালোবাসি মেঘ .. চলিষ্ণু মেঘ
... ঐ উঁচুতে ... ঐ উঁচুতে ...
আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল
(শার্ল বোদলেয়ার , বুদ্ধদেব বসুর
অনুবাদে)

কিছু কথার মতো সারাক্ষণ মাথায় থাকে না এই আসে আবার এই শূণ্যতা , সেই শূণ্যস্থানে আবার জল জমার ধর্ম । মনে পড়লো , শৈলী আমার তেমন একটা শূন্যস্থান যার ঠিক শব্দ খুঁজলে পাওয়া যাবে বন্ধুত্ব , সখ্য , ভালোবাসা কিংবা দখিনা বাতায়ন । শৈলী যেন এখন একটা বেদুয়িনের হারানো উট মানচিত্র বিহীন ম্যাগনেট শুন্য কম্পাস , হেঁটে যাচ্ছে দম টেনে ছেড়ে দেয়া খেলনা গাড়ির মতো।

প্রবন্ধ

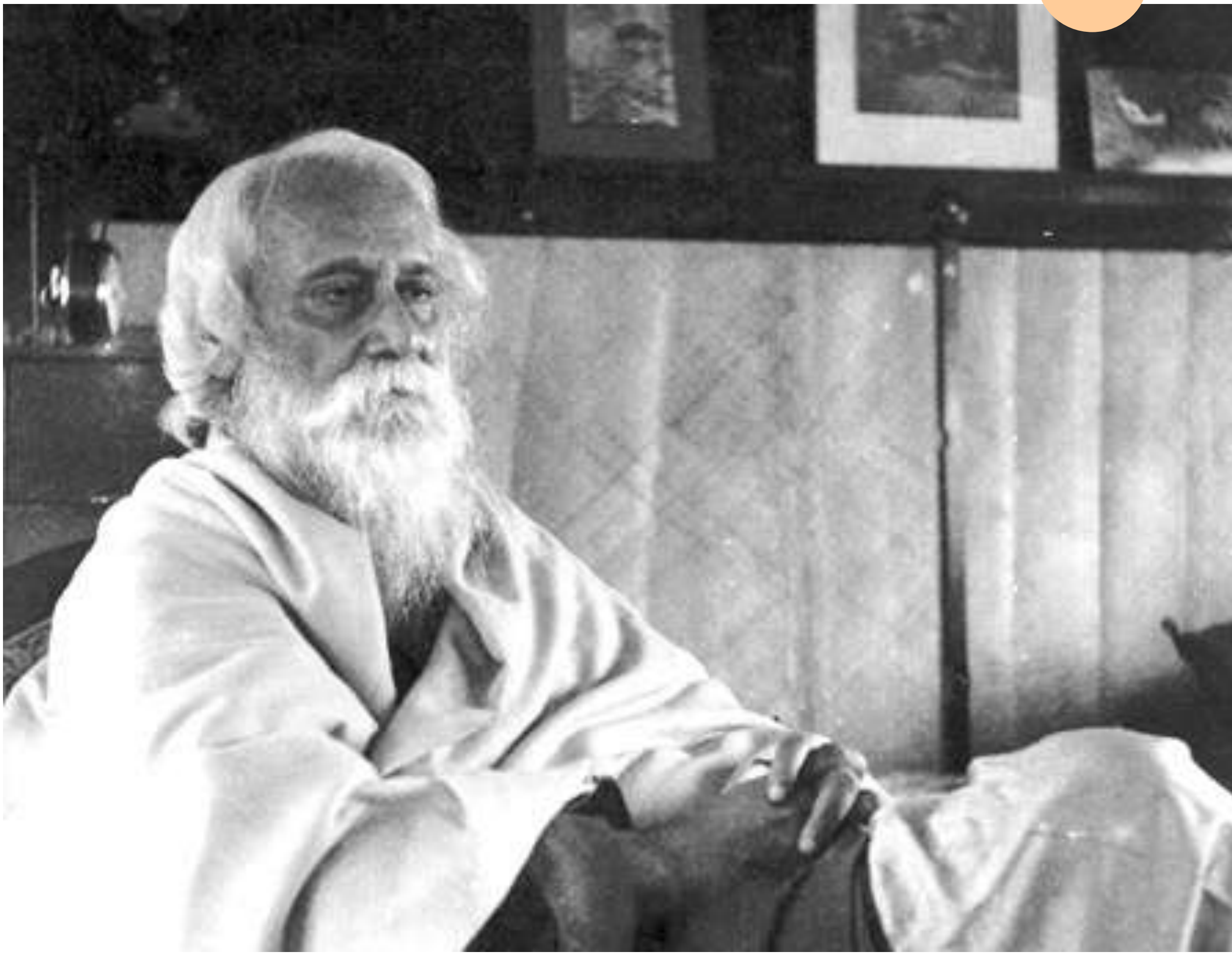

শৈলার সকাল রয়

বিষাদে বিবর্ণ বন্ধু রবীন্দ্রনাথ

“ ...সেই প্রথম বেলাতেই প্রশ্ন ছিলো কবিতাটি লিখেছেন একজন কবি কিন্তু কবি কি? মা বলতেন যারা কবিতা লিখে তারাই কবি; আর যিনি এটা লিখেছেন তিনি বিশ্বকবি ...... ”

প্রবন্ধ

এক.

রবীন্দ্রনাথ কে? এই প্রশ্নের উত্তরটা খুব সহজ, তিনি একজন কবি।
কিন্তু কবি জিনিসটা কি? উত্তরটা এখন খুব সহজেই বুঝতে পারলেও রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার যখন পরিচয় হয় তখন বুঝতে পারিনি আসলে কবি জিনিসটা কি?
রবীন্দ্রনাথের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ক্লাস ওয়ানে পড়বার সময়, আমি তখন সদ্য বর্ণমালা পড়ুয়া-নিত্যান্তই গোবেচারা টাইপের একজন ছাত্র।
স্কুলের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তিতে নাম দিয়েছি, 'বাড়ি বসে মা রোজ দুবেলা করে রবীর ছুটি কবিতাটি মুখস্ত করায়'। সেই প্রথম বেলাতেই প্রশ্ন ছিলো কবিতাটি লিখেছেন একজন কবি কিন্তু কবি কি? মা বলতেন যারা কবিতা লিখে তারাই কবি; আর যিনি এটা লিখেছেন তিনি বিশ্ব কবি
- মা-তারা কি মানুষ না?
বোকার ছাও বলে কি? কবিই মানুষ; মানুষই কবি তবে তারা আমাদের চেয়ে আলাদা।
সেই ভরা মঞ্চে পুরো কবিতা আবৃত্তি করা হয়ে উঠেনি সেদিন; গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছিলাম, দর্শক সারিদের সে কি হাসি! চোখে পানি এসে গিয়েছিলো! বাড়ি ফিরে বলেছিলাম মা- তোমার রবি কবি খুব পচাঁ! আমি আর তার কবিতা পড়বো না।ছোটবেলায় তার কবিতা দেখে ভয় পেতাম আস্তে আস্তে সে ধারনা পাল্টেছে আমি খুব সম্ভবত তার বীরপুরুষ কবিতাটিই প্রথম পছন্দ করেছিলাম। ক্লাস ফাইভে গল্পগুচ্ছ পেয়ে গেলাম; পড়ার বইয়ের চেয়ে বাইরের বইকে বেশি ভালোবেসে ফেললাম। তখনকার সময়ে আমাদের বাজার লাইব্রেরীতে এই বই পাওয়া যেত না বই আনতে হতো দীজেন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী থেকে। এরপর রবি বাবুকে ভালোবেসে ফেললাম। একে একে আমার হাতে উঠে এলো তার লেখা উপন্যাস গুলো; পড়লাম, ভাসলাম রবীন্দ্র সঙ্গীতের মুচ্ছনায় নিজেকে হারালাম। রবী বাবুর সমস্থ লেখাই যে ভালো লাগে তা নয়, তবে খারাপ লাগে এই সংখ্যাটা খুব কম।

শৈলার : সকাল রয়

নিজের সম্পর্কে: বলার মতো কিছুই নেই আপাতত ফটোগ্রাফার হয়েই দিন গুজরান করছি।

ভালো লাগে: আবৃত্তি করতে, বই পড়তে

প্রিয় ব্যক্তিত্য: রবীন্দ্রনাথ/ হিটলার

অবসরে: গান শোনা, প্রকৃতি দর্শন, সিনেমা দেখা।

শৈলী সম্পর্কে: সাহিত্য সাহিত্য একটা ভাব আছে, তাই ভালো লাগে। মাঝে মাঝে খারাপ লাগে যখন খুব স্লো হয়ে যায়।

প্রিয় বাণী: সাময়িক মিথ্যে বলে আনন্দ পাওয়ার চেয়ে সত্যি বলে কষ্ট পাওয়া ভালো

এরপর রবীবাবুকে জানতে চাইলাম? কেমন ছিলেন তিনি? তার পুরো জীবনটাই আমার কাছে অন্যরকম মনে হলো। আমার কাছে ভালো লাগলো তার সাংসারিক জীবন আর বেদনাদায়ক লাগলো কবির কষ্ট মাখা জীবনের কথা জেনে। বিশ্বকবির অন্তরেও কষ্ট ছিলো, দুঃখ ছিলো, ভাগ্যের পরিহাস ছিলো তবুও তিনি লিখেছেন থামেন নি আর সেটা ভেবেই অবাক লেগেছে। অনেকেই ভাবেন জমিদার পুত্র রবীন্দ্রনাথের কোন ভাবনা ছিলোনা তাই অবিরত লিখে ছিলেন কিন্তু মনে হয় এটা পুরোপুরি ঠিক না। তিনি কষ্ট পেয়েই হয়তো কিছু অসামান্য রচনা করতে পেরেছিলেন।

দুই.

" এই করেছ ভালো, নিঠুর
এই করেছ ভালো।
এমনি করেই হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।

আমার এ ধুপ না পোড়ালো
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালো
আমার এ-দ্বীপ না জ্বালালে
দেয়না কিছুই আলো।"

(গীতাঞ্জলী)

"কবি মৃণালীনি দেবীকে খুব ভালবাসলেও তাকে অন্তরঙ্গ ভাবে খুব কমই পেয়েছেন তার সংসার জীবন খুব একটা সুখের ছিলনা। কবিরা উদাসীন হয়, আপনভোলা হয়, আর সংসার জীবন তাদের কাছে অনেকটা নিয়মপালনের মতোই"

দহন না হলে হৃদয়ের গভীরতা বোঝা যায়না। কতটুকু গভীর যে হৃদয় তার গভীরতা মাপতে গেলে দহন হতে হবেই। কবিগুরু তার জীবনে কি দহন সয়ে ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ অবশ্যই সয়েছিলেন তা, না হলে অমন সুন্দর সব কাব্য রচনা হতোই না। খুলনার দক্ষিন ডিহি গ্রামের বেনীমাধব রায় চৌধুরীর কন্যা ভবতারিনীকেই রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করেন। বিয়ের পর ভবতারিনী'র নাম পাল্টে তিনি মৃণালীনি রাখেন। কবি মৃণালীনি দেবীকে খুব ভালবাসলেও তাকে অন্তরঙ্গ ভাবে খুব কমই পেয়েছেন তার সংসার জীবন খুব একটা সুখের ছিলনা। কবিরা উদাসীন হয়, আপনভোলা হয়, আর সংসার জীবন তাদের কাছে অনেকটা নিয়মপালনের মতোই। কবির পাঁচ সন্তানের সংসার জীবনে তিনি হয়তো কোন কারনে কিছুটা অতৃপ্তই ছিলেন। আর সেটার নমুনা পাই সংসার নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে।

কবি ছিলেন ভোজন বিলাসী। চিড়েরপুলি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই খেতে পছন্দ করতেন এছাড়া চিজ, বিস্কিট এগ অ্যান্ড বেকন, সারডিন, খই, মুড়ি পছন্দ করতেন। কবি সুগন্ধীযুক্ত আতপ চালের ভাত, আলু-কলা, পটল, ডালবাটা খেতে অভ্যস্ত ছিলেন তাছাড়া মৃণালীনি দেবীর নারকেল দিয়ে তৈয়ারী নারকেলের মিষ্টান্ন ছিল অধিক প্রিয়। মৃণালীনি দেবী রান্নায় ছিলেন অন্নপূর্না অনেকেই তার রান্নার প্রশংসা করতেন। একবার জগদীশ চন্দ্র বসু তার হাতে শাকের নানারকম তরকারী খেতে চেয়ে ছিলেন। মৃণালীনি দেবী শাকভাজা, শাকের ঘন্ট, শাকের চচ্চরী, শাকের ঝোল সহ প্রায় বিশ রকমের শাকের তৈয়ারী তরকারী জগদীশ চন্দ্র বসুকে খাইয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের এই ভোজনবিলাসী রবীন্দ্রনাথ বহু বছর নিরামিষভোজী ছিলেন তার একমাত্র কারন ছিলো পত্নী বিয়োগ। 'কবির জীবনেও ব্যর্থতা থাকে'-নতুন একটি কবিতা জন্ম দিতে না পারাই হয়তো কবির জীবনের ব্যর্থতা।

রবীন্দ্রনাথ মিতব্যয়ী ছিলেন তৎকালীন সময়ে সর্বসাকুল্যে তিনশত টাকা দিয়ে মাস পার করতেন। তিনি তার সন্তানদের কখনো প্রাচুর্য্যের মাঝে বড় করতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ওরা মানুষ হবে সাধারণ ভাবে হয়তো প্রাচুর্য্যে মধ্যে থাকলে তা হবেনা। সব পরিকল্পনা ছক মাপা থাকলেও কবি তার জীবনে কিছু কাজ করেছিলেন অপরিকল্পিত ভাবে যেমন- তিনি তার কন্যাদের বিয়ে দিয়েছিলেন অল্প বয়সেই, বেলার(মাধুরীলতা) বিয়ে দেন পনের বছর বয়সে, মীরারও বিয়ে দেন পনের বছর বয়সে আরো হতবাক হবার মতো ব্যপার যে, রানীর (রেনুকা) বিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র সাড়ে দশ বছর বয়সে। মেয়েদের বিয়েতে কবির অনেক খরচা হয় এবং এক পর্যায়ে তিনি অর্থ সংকটে পরে যান। উপলব্ধী করেন অর্থ সংকট কাকে বলে? কবির জীবনেও অনেক লাঞ্চনা,গঞ্জনা ছিলো উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তার পুত্র রথীন্দ্রনাথকে বিধবা বিবাহ করিয়েছিলেন বলে তার আত্নীয়-স্বজনরা এটা মেনে নেয়নি। তাকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছিলো এ জন্য। তাই তার জীবনে পথে দেখতে পাই তার অনেক কষ্ট চাপা ছিলো। তার দুঃখ ভরাক্রান্ত জীবনের প্রতিটা পরতে পরতে কষ্টের কালি দিয়ে কবিতা অাঁকা ছিলো আর তাই তিনি লিখেছিলেন

"চির জনমের বেদনা,
ওহে চির জনমের সাধনা
তোমার আগুন উঠুক হে জ্বেলে
কৃপা করিয়ো না দূর্বল ব'লে
যত তাপ পাই সহিবাওে চাই-
পুড়ে হোক ছাই বাসনা।"

(গীতাঞ্জলী)

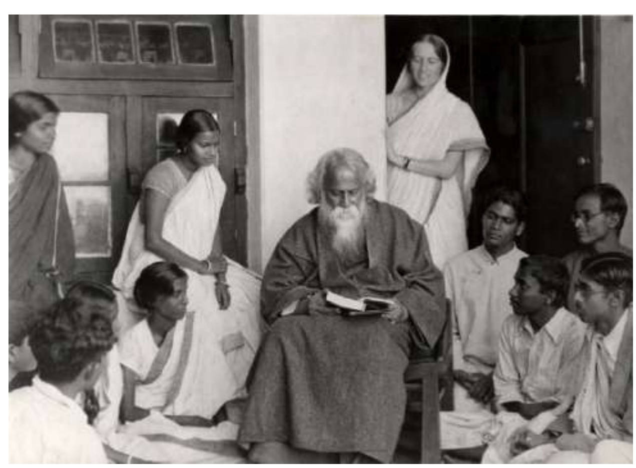

এই জগৎ মাজারে অদব্য কিছুই নয়। মহাকাল, মহাকাশ, মহাপাতাল, সবই মূল্যময়। মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছার মহাকাশে স্মৃতিরা বাসা বাঁধে, স্মৃতিরা কষ্ট বুননে, কষ্ট জাগরনে মনে করিয়ে দেয় প্রিয়দের বিদায় কিংবা জন্মলগ্ন। কবির পত্নী দীর্ঘ রোগ-ভোগে মারা যান। ব্যথিত কবি তার জীবনে কষ্টের কারন খুজে পাননি।

তার কন্য বেলার (মাধুরীলতা) মৃতুয হয়েছিলো ক্যান্সারে, রানীর (রেনুকা) মৃতুয হয়েছিলো যক্ষায় আর পূত্র শমীর মৃতুয হয়েছিলো কলেরায়। প্রত্যেকটা মৃতুযই তাকে ভরাক্রান্ত করেছিলো; হয়তো প্রতিটা মানুষের চিন্তাধারাটা একটু সময়ের জন্য হলেও থমকে যায় যখন মৃতুযর কথা মনে হয়। সকল আনন্দ যাতনা ভাগ করেই আমাদের বেঁেচ থাকা এই বিশ্ব সংসারে। নিজেকে প্রতিনিয়ত ফেরী করে বেড়ানো কিংবা অভিনয়ের মাঝে নিজেকে তুলে ধরা এই নিয়েই আমাদের জীবন। তাই কবি মৃতুয নিয়ে লিখেছেন

"মরণ যেদিন দিনের শেষে
আসবে তোমার দূয়ারে
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে।

ভরা আমার পরান খানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করবা না তো উহারে-"

জীবনের শেষ দিনে কি দেব শুধু এই পিতৃদত্ত প্রাণটি ছাড়া। স্বজন মৃতুয প্রতিটা মানুষের জীবনে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও কষ্ট দেয়। কবি পত্নীর হৃদয়া বিদারক মৃতুযর কথা মনে হলে আমি নিজেও খানিকটা কষ্ট অনুভব করি। মীরাদেবীর স্মৃতি কথায় পাই 'ঠাকুরবাড়ীতে লালবাড়ির দোতলায় মৃণালীনি দেবীর শেষ শয্যা পাতা হয়'।

ঘরে কোন আলো বাতাস খেলতো না, তখনকার দিনে বৈদুযতিক পাখা ছিলনা কবি তালপাখা দিয়ে দিনের পর দিন অবিরাম বাতাস করে গেছেন। সেই ঘরেই ১৩০৯ সালে ৭ই অঘ্রানে মৃণালীনি মৃতুযবরণ করেন। কবিকে বিবর্ন করে দেয় সেই মৃতুয। স্ত্রী'র মৃত্যু নিয়ে কবি লিখেছিলেন

তখন নিশীথ রাত্রি,গেলে ঘর হতে
যে পথে চল নি কভূ সে অজানা পথে।
যাবার বেলায় কেন বলিলে না কথা।
লইয়া গেলে না কারো বিদায়-বারতা।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই যেমন আলো আধারির খেলা আছে তেমনি কবির জীবনেও ছিলো তবে আধারটাই মনে হয় বেশি ছিলো অথচ বাহির থেকে কবিকে দেখে আমরা কি সুখি মানুষটাই না ভাবতাম। কবি চলে গেছেন সেই কবে কিন্তু আমার কাছে তার সে যাওয়াকে কখনোই মনে হয়না তাকে হারিয়েছি আমার এখনও মনে হয় তিনি রয়ে গেছেন আমার পাশে ঠিক সেই প্রথম বেলার মতো।

গ্রন্থপঞ্জী

১। রবীন্দ্রথের সংসার জীবন, তিতাশ চৌধুরী, ভারত বিচিত্রা।
২। মৈত্রেয়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, কলকাতা
৩। চিত্রাদেব, ঠাকুর বাড়ীর অন্দর মহল, কলকাতা বৈশাখ-১৪০০

প্রবন্ধ

শৈলার বহ্নিশিখা

কোচিং সেন্টারের রাহুগ্রাসে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা

“আর এই মেধাহীন, মেরুদন্ডহীন জীবনকে অন্তসারশূন্য করার কারিগর বর্তমান কোচিং নামধারী এক ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থ”।

প্রবন্ধ

দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কোচিং সেন্টার বহুল আলোচিত একটি নাম। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের নামে এটি এখন চাতুরি ব্যবসায় পরিণত। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠেছে এ ব্যবসা। নজরকাড়া বিজ্ঞাপন ও প্রশ্নপত্র ফাঁস করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করায় লেখাপড়ার মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে কোচিংকে চিহ্নিত করা মোটেও অযৌক্তিক নয়। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে, কোচিংয়ে পড়লেই পরীক্ষা পাশ অনিবার্য।মেধা থাকুক বা না থাকুক, এ নিয়ে বিচলিত নন কেউ।

ভালো ফলাফলকারীরা যে এ সমাজে অবশ্যই প্রশংসনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অভিভাবকেরাও সন্তুষ্ট হন যখন তাদের ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করে। কিন্তু এর পিছনে তাদের সন্তানদের কতটুকু মেধার বিকাশ ঘটল তা খতিয়ে দেখার কেউ নেই। আর খতিয়ে দেখারই বা কী প্রয়োজন, যখন সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রাখছে এই কোচিং। যদিও জ্ঞানার্জনের প্রধান উদ্দেশ্য চাকরি পাওয়া নয়, তবু একটি চাকরি সমস্যাসঙ্কুল জীবনে চলার পাথেয়। আর এই মেধাহীন, মেরুদন্ডহীন জীবনকে অন্তসারশূন্য করার কারিগর বর্তমান কোচিং নামধারী এক ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে। প্রকৃত জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যদের ওপর ভর করে আমাদের এই সোনার বাংলা এগিয়ে যাবে বহুদূর। অথচ, কোচিং সেন্টারের বদৌলতেই জাতির মেরুদন্ড আজ বিপর্যস্ত।

কোচিং ব্যবসার অন্তরালে চলছে নানা অনৈতিক কার্যক্রম। প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ এ প্রতিষ্ঠান তাদের সুনাম বৃদ্ধির জন্য হয়ে ওঠে ভয়ানক রকমের বেপরোয়া। প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মেধাবী শিক্ষকদের লোভনীয় টাকার অঙ্কে সংশ্লিষ্ট করে নেয় কোচিং সেন্টারের মালিকরা। ফলে, রিডিং পিরিয়ডে রীতিমতো কিংবা মানসম্মত লেখাপড়া এখন আর হয় না। কোচিং সেন্টারের সমৃদ্ধি ও নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের এমনকি অভিভাবকদের পরামর্শ দেন কোচিংয়ে ভর্তির জন্য। আবার দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুলগুলোতে ক্লাস শুরুর আগে ও ছুটির পর স্কুলের ভিতরেই শুরু হয় এক বিশেষ কোচিং ক্লাসের। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য এ কোচিংক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য জনপ্রতি ৩শ থেকে ৫শ টাকা পর্যন্ত মাসিক ফি নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই কোচিংক্লাসে যদি কোনো শিক্ষার্থী পড়তে না চায় তবে কোচিংয়ের জন্য নির্ধারিত ফি পরিশোধ শেষেই পরীক্ষার প্রবেশপত্র দেওয়া হয়। অর্থাৎ ধার্যকৃত ফি প্রদান বাধ্যতামূলক, কেউ পড়ুক না পড়ুক। এমন অনৈতিকতার মধ্যেও অনেক শিক্ষক তার ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের পড়া তৈরি না হলে পুনরায় বুঝানোর পরিবর্তে চালান বেত্রাঘাত—অমানবিক নির্যাতন। লাভের মধ্যে একটাই লাভ, অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থী ওই শিক্ষকের প্রাইভেট টিচিং হোম অথবা কোচিং সেন্টারের শরণাপন্ন হতে বাধ্য।

বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রসপেক্টাস আর নজরকাড়া বিজ্ঞাপন নির্ভর কোচিং সেন্টারের অন্তরালে সবচেয়ে বড় ধরনের বে-আইনি ব্যবসা হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস। এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গত দশ বছরের খতিয়ান খুললেই পরিস্কার হয়ে যায় কোচিং ব্যবসার যথার্থ রূপ। এই সময়ের মধ্যে মাধমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষা, সমাজসেবা পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষা, প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ পরীক্ষা, চারুকলা ইন্সটিটিউটের পরীক্ষা এবং বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষাতেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে অহরহ। সরকারি তদন্ত টিম সার্বিক অনুসন্ধান শেষে আঙুল তুলেছিল কিছু নামী-বেনামী কোচিং সেন্টারের উপর। যারা মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এই অসৎ কাজে প্ররোচনা দেয়। আর যেভাবেই হোক, যে মাধ্যমেই হোক প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায় স্বপ্নে প্রাপ্ত ওষুধের মতো। ন্যাক্কারজনক এই কাজে কোচিং সেন্টারের যেমন দোষ আছে তেমনই দোষ আছে সরকারি বিধিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। জাতীয় শিক্ষাক্রমের আওতায় যেসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার সিংহভাগই নস্যাৎ হয় টাস্কবোর্ড প্রণীত বিধিমালার যথার্থ প্রয়োগ না হবার জন্য। অপরদিকে, সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে নিয়োগ পরীক্ষাগুলো হয়েছে তাতেও একাধিকবার অভিযোগ উঠেছিল। মোটকথা, সরকারের নজরদারিতে অবহেলা কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য বাড়িয়েছে বহুগুণ।

বিভিন্ন অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রসপেক্টাস আর নজরকাড়া বিজ্ঞাপন নির্ভর কোচিং সেন্টারের অন্তরালে সবচেয়ে বড় ধরনের বে-আইনি ব্যবসা হচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁস। এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সুবাদে এবং সরকারের নীরব ভূমিকার বদৌলতেই কোচিং ব্যবসার প্রসার ঘটেছে অতি দ্রুত। শিক্ষার সবক্ষেত্রেই কোচিংয়ের এখন সরব উপস্থিতি। শিশুশ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষার পর্যায় পর্যন্ত কোচিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ক্যাডেট কলেজ, বুয়েট, মেডিক্যাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, কারিগরি শিক্ষা ছাড়াও বিসিএস পরীক্ষাসহ সরকারি বিভিন্ন চাকরির লিখিত পরীক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোচিং পরম নির্ভরশীল এক মাধ্যম। এ ছাড়াও প্রতিটি ক্লাসে একাডেমিক কোচিং, সেনাবাহিনীতে ভর্তি, টোফেল, জিআরই ও জিম্যাটের জন্য কোচিংয়ের ব্যবস্থা থাকায় বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচন্ড হুমকির সম্মুখীন।

কোচিংয়ের কুফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ২০০৩ সালে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছিলেন, পরীক্ষা এখন বাণিজ্য হয়ে গেছে। টাকার বিনিময়ে সবকিছু হচ্ছে। কোচিং ব্যবসায়ীরা সেটাই করছে। কোচিং সেন্টার যে কারণে চলছে সেগুলো তুলে দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসনির্ভর হতে হবে।

পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেছিলেন, শিক্ষকেরাই তো প্রথমে কোচিং শুরু করেছিল। এটি বর্তমানে এক ধরনের ব্যবসা। আইন দিয়ে কোচিং কিভাবে নিষিদ্ধ হবে, আগে তো একবার গাইড বই নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা কি হয়েছে? শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন।

অপ্রিয় হলেও সত্যি, একদা সরকার পক্ষ থেকে গাইড বই বন্ধের রব উঠেছিল। সরকারি বিধিমালা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক উদ্যোগ অদ্যাবধি তথৈবচ। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভুল করেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসার জন্য পা মাড়ায় নি। এ ঘটনা দেশের জন্য খুবই হতাশাজনক। বারবার ঘোলাটে পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনের অনাগ্রহ ও ব্যর্থতা কোচিং ব্যবসাকে আরো সুদৃঢ় করেছে দিনের পর দিন। এর মূল কারণ হলো– কোচিংনির্ভর নানা সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এলাকার উচ্চ পর্যায়ের সরকারি আমলা, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও এমপি-মন্ত্রীদের প্রধান-বিশেষ অতিথি রেখে কার্যক্রম চালায় এবং তাদের মূল্যবান উপহার সামগ্রী ছাড়াও নানা অনুষঙ্গে পদকের ব্যবস্থা রাখে চতুর কোচিং মালিকরা।

এমনকি কোনো কোনো কোচিং দেশের রাঘব-বোয়ালদের উপদেষ্টা বা কার্যকরী কমিটিতেও স্থান দেয়। এতে যেমন কোচিং ব্যবসা রাজনৈতিক রোষানলমুক্ত ও অবস্থানগতভাবে সুদৃঢ় হয়, অপরদিকে নেতাকর্মীরা থাকেন তুষ্ট। আর এভাবেই শিরদাঁড়া খাড়া করে এখনো ডালপালা ছড়াচ্ছে কোচিং ব্যবসা।

আসলে সবকিছুর পিছনেই রয়েছে রাজনৈতিক মদদ ও স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা। দেশের কলুষিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিরপেক্ষতা ও মননশীলতা যেমন জরুরি তার চেয়েও জরুরি রাজনীতিকদের মধ্যে দেশপ্রেম, যার ছোঁয়ায় সব সেক্টরই হবে শুদ্ধ। জাতীয় জীবনেএর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বায়নের এই যুগে শিক্ষা শুধু জাতির মেরুদন্ড নয়, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজের স্বতন্ত্র-সত্তা সমুন্নত রাখার গৌরব। এ গৌরব টিকিয়ে রাখার জন্য নিরপেক্ষ রাজনীতির ধারায় সবার আগে শিক্ষাব্যবস্থাকে আগাছামুক্ত করা দরকার। কোচিং সেন্টারের রাহুগ্রাস থেকে শিক্ষার পরিবেশ ও মান ছিনিয়ে এনে স্কুল-কলেজমুখী করাটাই এখন সবচেয়ে জরুরি।

রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হোক
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা!

তোমার সত্ত্বা পাবে ঈশ্বরের শুদ্ধতা

আঁধারের সাথে সঙ্গম শেষে
সহস্র সাধনার পর
পূর্ণ হয় সত্ত্বা
তৃতীয় জন্ম জাগরণের কথা বলে
মৃত্যুই মূলত শেষ জন্ম
যখন যৌবন পায়, পূর্ণ অমরত্ব

অলীক কল্পনা নয়
নারকীয় পথে সাহসী প্রহরীর প্রবেশে
তোমার সত্ত্বা পাবে ঈশ্বরের শুদ্ধতা
সমাপ্ত কর প্রহেলিকা কাল
সুন্দরের আলোকে

অন্ধের চোখে আলো জ্বেলে
জাগ্রত হও, জেগে ওঠো
জগতের অমরত্বে...

সালেহীন ইয়াজুয নির্ভয়

নিজ পরিচিতি

মহাজাগতিক আলোয়
ফিরে দেখা মানুষ।

শৈলী ব্লগে প্রবেশ করা
মানেই পৃথিবীর পার্থিব
জগতের বাইরে চলে
আসা।

গল্প

একটি ওয়েটিং রুম ও কিছু জলছাপ

শৈলার রাবেয়া রব্বানি

"......হাতের পত্রিকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হল। সময় কাটানোর জন্য কোন কিছুতেই মনযোগী হতে পারছি না। এলোমেলো চোখ বুলাতে থাকলাম ওয়েটিং রুমে ঢুকতে থাকা মানুষগুলোর উপর। মনে হয় ডোমেস্টিক ফ্লাইটে বেশির ভাগ পারিবারিক [illegible] যাচ্ছে মানুষ......"

গল্প

(১)
সাড়ে এগারোটার ফ্লাইট। এখন বাজে সাড়ে দশটা। এমনিতেই এয়ারপোর্টের ওয়েটিং রুমে বসে থাকা আর জেল খাটা আমার কাছে একই রকম লাগে তার উপর সিগারেট খেতে উঠে বাইরে যাওয়া যাবে না ভেবে আরো বিরক্ত লাগছে।
-ভাইয়া এই এক ঘণ্টা কি করা যায়?
উত্তর অপেক্ষা না করে প্রশ্নটা সিগারেটের ধোঁয়ার মত ভুস করে ছেড়ে দিল রাহুল, আমিও উত্তর দিলাম না। সে কানে ইয়ার ফোন গুজে নিলো, ছেলেটার মাঝে তথাকথিত ডুড ভাব প্রবল।
দেশে আসলেই প্রায়ই আত্মীয় পরিজন সব ঠেলেঠুলে কক্সবাজার চলে যাই। এবার ছোট ফুফুর এই ছেলেটি আগে থেকেই কাঁধে চড়ে ছিল, আমার বাবা তাতে আহ্লাদিত হয়ে একেবারে মাথায় তুলে দিলেন। রাহুল আমার বয়সে বেশ কিছু ছোট, কিছুদিন আগেও কিশোর হিসাবেই দেখেছি তাই সখ্যতা একেবারেই কম ।কিন্তু তাকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই খুব বেশি সহজ স্বচ্ছন্দ। এবার বোধ হয় আমার প্রবাসী ক্লান্ত মনটাকে প্রিয় সমুদ্রটির কাছে জমা রাখতে পারব না। রাহুলের ব্যাগ আর সাজসজ্জা দেখে মনে হচ্ছে কক্সবাজার গিয়ে সে আমার মাথায় কত্থক নৃত্য নাচবে।
হাতের পত্রিকাটি ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে হল। সময় কাটানোর জন্য কোন কিছুতেই মনযোগী হতে পারছি না। এলোমেলো চোখ বুলাতে থাকলাম ওয়েটিং রুমে ঢুকতে থাকা মানুষগুলোর উপর। মনে হয় ডোমেস্টিক ফ্লাইটে বেশির ভাগ পারিবারিক ট্যুরে যাচ্ছে মানুষ। চোখে মুখের ছুটি ছুটি আমেজ আর উৎসাহে এদের সহজেই আলাদা করে ফেলা যাবে। হঠাৎ চোখে প্রশান্তি এনে দেয় এমন নীল কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটি মেয়ে নীল আর আবছা রূপোলী সালোয়ার কামিজে সিকিউরিটি পার করল। বয়স হয়ত বাইশ থেকে পঁচিশের মাঝামাঝি হবে। মেয়েটির সাথে একটি কিশোর আর একটি মাঝ বয়সী পুরুষ। তারা আস্তে আস্তে এদিকেই এসে আমাদের বাম পাশ বরাবর সারিতে বসল। এখন আমার আর নীল রঙা মেয়েটির মাঝখানে শুধু মানুষ চলাচলের ছোট ফাঁকা জায়গা।

রাবেয়া রব্বানি
আমি : কংক্রিটের দেয়ালে ঘেরা ছন্দহীন নাগরিক জীবন, জানালা আর বারান্দায় চিলতে চিলতে আকাশ দেখা ; অতৃপ্তি আর দীর্ঘশ্বাস _ অনুভূতিতে আকাশটাকে আরো বড় করে দেখতে চাওয়া আর কিছু ভালো লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে লেখা-লেখির এই ক্ষুদ্র প্রায়াসে আমি _ "রাবেয়া রব্বানি"
প্রিয় মানুষ : " বাবা " **প্রিয় বাণী** : " ছোট ব্যাপারে স্বার্থকতার চেয়ে বড়
ব্যাপারে ব্যর্থতা অনেক ভালো "_ব্রাটান্ড রাসেল ।

সেল ফোনটা বেজে উঠায় আমি কিছুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে যাই। কথা বলতে বলতে বে-খেয়ালী চোখ সারা ঘরটা চষে বেড়ায়। একটা ছুটতে থাকা দুরন্ত শিশু, তার পেছনে ব্যস্ত মা, পেট কাঁপিয়ে হাসা মধ্যবয়স্ক লোক, চুইংগাম চিবাতে থাকা তরুণী, এয়ার লাইন্স গুলোর সার্ভিসিং এর মানুষ, সোনালী চুলো এক বিদেশিনী ঘুম ঘুম চোখ, কবুতরের জোড়ার মত এক দম্পতি, গুটিসুটি মেরে বসে থাকা খুব উদ্বিগ্ন চেহারার এক তরুণ, তারপর নীল রংটার ভেতর এক উজ্জ্বল মানবী। আমার দৃষ্টি এখানে এসে থেমে গেলো। এবং থেমে থাকতে চাইল।

হঠাৎ এই ওয়েটিং রুমটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, যেন একে নতুন করে দেখার কিছু নেই এটার নারী-নক্ষত্র আমার চেনা। মেয়েটির দিকে চোখ বার বার চলে যাওয়ার কারণ এখন বেশ খানিকটা স্পষ্ট হতে থাকল আমার কাছে। আমার চোখ আবার নীল রঙ অনুসরণ করে। মেয়েটি হয়ত অন্য কিছু ভাবছে। আসলে যে তা নয় তাকে তা বোঝানেরও কোন উপায় নেই। এই পরিস্থিতি আমার জন্য নতুন নয়। এ ক্ষেত্রে বিস্ময়ের সাথে অস্বস্তি হয় প্রচণ্ড।

অস্বস্তি এড়াতে নিজের নোট-বুকটা বের করি। আমার কাছে এই পরিস্থিতিতে ব্যস্ত থাকার সবচেয়ে ভালো উপায় হল নিজেকে নিজে লেখা। এরমধ্যে আমার বেয়ারা চোখ আর একবার মেয়েটির মুখ ঘুরে এলো। সে এবার ওয়াশ রুমে গিয়ে তার মুখ ধুয়ে এসেছে, তার চোখের কাজল বেশ খানিক ছড়িয়ে গেছে, সারা মুখে যুবতী বিড়ালীর মতো খুব মোলায়েম মায়া, গোলাপি ঠোঁট প্রসাধন হীন। হঠাৎ মেয়েটির সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক ঝোঁকে তাকালেও এই প্রথম

আমি হ্যাঙলার মত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকি না কারণ আমাকে দিনে অন্তত ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন মোটামুটি সুন্দরী মেয়ের মুখোমুখি হতে হয় এবং এই কারণে মেয়েরা আমার কিছুটা চোখ সওয়া। তবু চোখ নামাতে খানিক সময় নিলাম, অবশ্য মেয়েটাও সময় নিলো। কেন জানি আমার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে কিন্তু এটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই লিখতে শুরু করি, আমাকে আমার চিঠি ,

-মেয়েটির ভেজা মুখের নরম মায়া, ওয়েটিং রুমটির মানুষগুলোর ব্যস্ততার প্রলেপ খুলে রাখা মুখ, খুব সুন্দর শীতের সকাল! আপনার সিগারেট এবং স্কেচ দুটোতেই মন টানছে তাই না মিঃ শান্তনু? কিন্তু আপনি ভয়াবহ অস্বস্তি আর টেনশনে ডুবে যাচ্ছেন। আপনার কাছে মনে হচ্ছে এই সকালটা পাশের সব দৃশ্য, সমুদ্রের মত নীল রঙ্গা মেয়েটি সহ ঘটনাটি আগেই ঘটেছে। দৃশ্যগুলো পুরোনো একটি ছবির মত। আসলে তা ঠিক নয়। আচ্ছা ধরুন ঘটনাটি যদি আগেই ঘটে থাকে তাহলে বলুন তো এর পরের মুহূর্তে কি হবে? চুপ করে আছেন যে ?পারছেন না তাই তো?এর মানে হলো ডিজ্যাঁভু ডিসঅর্ডারটা আবার ভর করল। এর পরেই ভয়াবহ ডিপ্রেশনে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। মিঃ শান্তনু আপনি মেয়েটার দিকে তাকাবেন না। আপনি বরং আপনার মৃত মাকে চিঠি লিখুন। মৃত মানুষকে মন খুলে সব বলতে পারার কথা।

আমি আমাকে লেখা চিঠিটা বেশিদূর নিতে পারলাম না। অবচেতন ভাবে মাকে চিঠি লেখার নামে বের হয়ে এলাম। আবার প্রচণ্ড কৌতূহলে তাকাতে চাইলাম চারপাশটায়, মেয়েটার দিকে। ডিজ্যাঁভুর সময় পরিচিত লাগতে থাকা দৃশ্যগুলো যেমন অস্বস্তি তৈরি করে তেমন দেখার একটা নেশাও থাকে যা খুব টানে।

রাহুলের মধ্যে হয়ত কিছু ভদ্রতা আছে সে আমার লেখায় উকি দিলো না তবে দু' বার কি যেন বলল। আমি ইচ্ছে করেই শুনেও শুনলাম না। তাড়াতাড়ি মায়ের সাথে কথোপকথনে ডুবে যেতে চাইলাম।

মা,

তুমি জানো? এখন আর স্কেচ করতে পারি না। মানুষের মুখ স্কেচ করতে গেলে তার ঠোঁটে এমন হাসি দিয়ে দেই মনে হয় সে কোন পণ্যের বিজ্ঞাপন করছে। আর প্রকৃতি আঁকতে গেলে সভ্যতার অসুখগুলো বিকৃত ভাবে ফুটে উঠে। চোখ বুজে কিছু কল্পনা করতে গেলেই ভাসে ডিএনএ' র মত জড়াজড়ি করে থাকা সংখ্যা।
সিঙ্গাপুরে দু দুটো ছোটখাটো ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক হয়ে বসে আছি কিভাবে, এখন ভাবলে দুঃস্বপ্নের মত লাগে, মা। মনে হয় আমি একটা যন্ত্রের ভেতর হাত পা ঢুকিয়ে বসেছিলাম,হঠাৎ আটকা পড়ে গেছি আর বেরোতে পারছি না। শুধু মাথার মধ্যে সংখ্যাগুলোই ঘুরপাক খায়, ডিগবাজি দেয়, সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ইচ্ছে হয় লাথি মেরে চলে আসি কিন্তু সব গেড়ে বসে গেছে একেবারে। আসতে গেলে নিজেকে অর্ধেক ছিঁড়েই আসতে হবে।
জুরং এ আমার অফিসে বসে বসে সি সি ক্যামেরা দিয়ে ওত পেতে তাকিয়ে থাকা, সেলস ম্যানের ভুল ধরা, কাগজে, পিসিতে ফুটে থাকা সংখ্যা আমার মাথায় পোকার মত অদ্ভুত সম্মিলিত গুঞ্জন শুরু করে। আমার প্রায়ই প্রচণ্ড ইচ্ছে হয় মগজটাকে মাথা থেকে খুলে রেখে দেই। স্লিপিং পিল খেয়ে কত রাত পার করি মা। অথচ তুমি বলতে আমি নাকি কুম্ভকর্ণ।
মা, সবচেয়ে মজার কথা কি জানো? তোমার বোনের যেই মেয়েটিকে হারিয়ে, টাকা কে জীবন মনে হলো, এবার তোমার মৃত্যু বার্ষিকীতে তাকে দেখে, কথা বলে হতাশ হয়ে গেলাম। সে এখন বিশাল দেহের , গয়নার আবরণে মোড়া এক স্থূল মনের মহিলা। আমি খুঁজেও তার মাঝে আগের শ্যামাকে পেলাম না। আর এই মেয়েটির বিরহেই আমি কিনা পয়সার পেছনে ছুটে ব্যবসায়ী আর দোকানি হয়ে গেলাম। হা! হা!
ভালো কথা না লিখে মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয় এমন কথাই লিখে ফেলছি। মাকে আর লিখতে ইচ্ছে হলো না। নোটবুক নামক বস্তুটাকে অহেতুক ভারী লাগতে লাগল। সিগারেটের তৃষ্ণাটাও মাথা চাড়া দিল। হঠাৎ রাহুল তাড়া দেয়,
-ভাইয়া আমাদের ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জাররা এখনই যাবে।
আমি নোটপ্যাড থেকে আবার ডিজ্যাঁভু নিয়ে বের হয়ে এলাম আবার পরিচিত লাগতে থাকা ওয়েটিং রুম, আর মাঝখানে মধ্যমণি হয়ে ফুটে থাকা মেয়েটির জগতে।

আমরা প্লেনের উদ্দেশ্যে ওয়েটিং রুম থেকে বেরুচ্ছি, সাথে নীল রংটাও। সরাসরি না তাকালেও চোখের সীমানায় রংটি ঠিকঠাক জানান দিচ্ছে।

(২)

ওয়েটিং রুমে ঢুকেই ধুসর কোর্ট পড়া লোকটাকে চোখে পড়ে। ভিড়ের মধ্যেও কিছু মানুষ কেমন করে যেন আলাদা হয়ে থাকে।এই লোকটাও তেমন, পুরো ওয়েটিং রুমে এতগুলো মানুষের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে আছে। সেই রহস্য বুঝতেই হয়ত আমার অবচেতন মন আমার দৃষ্টিকে বার বার সেখানে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। তা না হলে পুরুষ মানুষে আমার আলগা ঝোঁক নেই। মামাও কি মনে করে তাদের বরাবর সারিতেই আমাদের বসার জায়গা করে নেন। বসার পর লোকটা অন্য দিকে তাকালে আমি তাকে ভালো করে দেখে নেই। বয়স ত্রিশোর্ধ হবে হয়তো, দীর্ঘ দেহ, রিম-লেস চশমায় বেশ স্বচ্ছতা, গায়ের রঙ শ্যামলা, তীক্ষ্ণ নাক, চোখ তেমন বড় না আবার ছোট না, চেহারায় নিখুঁত ভাব প্রবল কিন্তু তাতে মেয়েলী কোন অবয়ব নেই। একটু বড় চুল পেছনে ঝুটি করা অথচ ব্যক্তিত্ব আর ভদ্রতা তার অভিব্যক্তিতে স্পষ্ট। পোষাকে পরিপাটি ভাবটা একটু বেশি। আমার মনে হচ্ছে লোকটা প্রবাসই, সাধারণত দেশের বাইরে থাকা লোকদের মধ্যে এমন একটা আলগা চটক থাকে। অবচেতন কৌতূহল মেটে কিছুটা। লোকটার চোখে চোখ পড়ার আগেই আমি পিয়ালের দিকে মুখ ফেরাই।

আমরা যাচ্ছি কক্সবাজার, মামার বাড়ি। আমি, মামা আর আমার ছোট ভাই পিয়াল। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে প্রতিবছর মামা নিজে এসে আমাদের নিয়ে যান। এমনিতে আমরা প্রতিবার বাসে যাই কিন্তু এবার পিয়ালের আবদারে প্লেন চড়া। আর এবার মামার উৎসাহ-উদ্দীপনাও একটু বেশি। ওনার মতে ওখানকার সবচেয়ে যোগ্য পাত্রের সাথে তিনি আমার বিয়ে প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন কারণ আমাকে যে তাদের পছন্দ হবে এই ব্যাপারে মামার কোন সন্দেহ নাই। ছেলে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি থেকে মাস্টার্স, বয়স কম হলেও মামার সহকর্মী, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিটিতে বেশ ভালো পোষ্টে আছে ,পাশাপাশি কিছু হোটেল আর গো-কার্ডের বিজনেস আছে ,পারিবারিক সম্পত্তির লিস্টও বিশাল। মাও এবার আমার ব্যাগ বিশেষ ভারী করে দিলেন, বললেন 'ঘুরতে টুরতে যাবি জামা কাপড় তো লাগবেই' । আমি কিছু বলিনি। বিয়েতে আমার তেমন মত না থাকলেও আমি আমার সংসার-পোড়া বিধবা মাকে হতাশ করি না। আসার সময় মা এমন মুখ করে ছিলেন মনে হচ্ছিল আমার বিয়ে হয়ে গেছে আর আমি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, আমার যথেষ্ট বিরক্ত লাগলেও বুঝাইনি। সিএনজিতে বসে ভারী ব্যাগটা হাতে নিয়ে বসে আমিও ইতিবাচক বিদায় দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি তোমরা রাজী হলে

আমিও রাজি।
মনে হচ্ছিল এবার মামার বাড়ি নয় এক অজানা গন্তব্যে যাচ্ছি তবে এয়ারপোর্টে আসতে আসতে জানুয়ারি মাসের ধুলোময় ঢাকার কিছু ধুলো সারা শরীরে, চুলে মেখে এসেছি। আমার ধুলোতে খুব অস্বস্তি তাই ওয়াশ রুমে গিয়ে মুখ ধুতে গেলাম। ফিরে আসতে আসতে আঁচ করি লোকটি আমাকে দেখছে। এমনিতে পুরুষরা তো তাকায়ই কিন্তু আমি যার প্রতি কৌতূহল বোধ করছি সেও আমাকে কেমন কৌতূহলী চোখে দেখছে তা বুঝতে গিয়ে একটা ভীষণ একটা চোখাচোখি হয়ে গেলো। একটা সুন্দর দৃশ্য দেখার মত লোকটার চাউনিতে আমি মুগ্ধ হলাম, চোখ নামাতে সময় নিলাম হয়ত তাই। ছিঃ লোকটা হয়ত ভাবছে আমি কেমন না কেমন মেয়ে!নিজের কাছে নিজে লজ্জা পেয়ে ব্যাগ হাতড়ে ম্যাগাজিন খুঁজতে থাকি। হঠাৎ আমার ছোট ভাই পিয়াল আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে প্রশ্ন করে, -আপু প্লেনে উঠলে বমি আসে?
-নাহ!কে বলল?
-শান্ত। ও যখন বাবা-মার সাথে টার্কি গিয়েছিল তখন নাকি ওর বমি এসেছিল।
মামা আমাদের থামিয়ে দিয়ে বলল,
-দুর!ওটা বড় জার্নি তে হতে পারে এখানে খুব কম সময় মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কিচ্ছু হবে না। জুই, আমার ব্যাগ থেকে ঔষধের বাক্সটা দে তো!
আমি মামাকে ঔষধের বাক্স দেই। পিয়াল তবু শান্ত হয় না। মামাকে নানান প্রশ্ন করতে থাকে।
বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া কাজ নেই। মামা আর পিয়াল খেলা নিয়ে কথা বলছে এখন, যার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আমার ডানদিকের বরাবর সারিতে বে-খেয়ালী চোখ বুলাতেই দেখলাম লোকটা খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন লিখছে। তার ওপাশে জানালার পাশে বসা একটা ছেলে আমার দিকে তাকিয়ে নিজের চূলে এমন ভাবে হাত বুলালো, যেন সে আমাকেই ছুলো। ছেলেটা হেসে মিষ্টি ইশারা করতে চাইলো। নিজের অবাধ্য চোখের উচিত শিক্ষা হয়েছে, ভাবলাম। আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে পিয়াল আর মামার গল্প মনোযোগী হতে চাইলাম। তাদের কথার ভিতর নিজেকে জোর পূর্বক ঢুকিয়ে দিয়ে প্লেনে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।
আমরা এখন একই ফ্লাইটের লোকেরা এয়ারপোর্টের গাড়ী করে প্লেনের কাছে যাচ্ছি। গাড়ীতে লোকটাও যাচ্ছে। লোকটাও যে একই এয়ারলাইন্সের একই ফ্লাইটেই যাচ্ছে এটা দেখে কেন জানি ভালো লাগল। তবে এবার আর তাকালাম না।

প্লেনের কাছাকাছি আসতেই পিয়াল অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ল, সে কল্পনার সাথে বাস্তব মিলাতে চাচ্ছে। আমার কাছে একদম ভালো লাগছে না। ডোমেস্টিকের বেলায় প্রাইভেট এয়ারলাইন্সের প্লেনগুলো তুলনামূলক ভাবে ছোট হয় শুনেছিলাম, আসলেও তাই। এয়ার-হোস্টেজের সাথে মেকি হাসি বিনিময় করে ভেতরে ঢুকতেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।এই জানুয়ারি মাসেও প্লেনটি প্রচণ্ড গরম হয়ে আছে। ভেতরটা অনেক চাপা বসার আর জায়গা এত ছোট যে তেমন নড়াচড়াও করা যাবে না ।আমার মনে হলো এর চেয়ে লোকাল বাসও বুঝি ভালো। অনেকেই একটু জোড়ে বিরক্তিতে একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিচ্ছে 'এসি কাজ করে না নাকি?' হঠাৎ পিয়াল বলল,

-আপু আমার বমি আসছে। অনেক গরম!

-কিচ্ছু হবে না। তুমি এই পাশে আসো।

আমি উঠে আমার জায়গা ছেড়ে ওকে জানালার পাশে বসতে দেই যাতে ও বাইরের দৃশ্য দেখতে পায় আর বমি ভাবটা কমে। মনে হলো ভেতরে ঢুকে পিয়াল বেচারাও কিছুটা হতাশ। মামা পাশের সিট থেকে আমাদের ইশারায় বেল্ট বাধতে বললেন। আমরা বেল্ট বেধে টেক অফের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি আর মনে মনে বলতে লাগলাম 'আল্লাহ!স্বপ্নের মত দ্রুত কক্সবাজারে পৌঁছে গেলেই বাঁচি!'
রানওয়ে পার করতে করতে প্রচণ্ড স্বরে প্লেনের ইঞ্জিন আওয়াজ করে টেক অফের জন্য রেডি হচ্ছে। পিয়ালের মুখে হাসি আর ভয় মিশ্রিত অনুভূতি। সে শক্ত করে আমার হাত ধরে আছে। আমিও কিছুটা উত্তেজনা বোধ করছি। মাধ্যাকর্ষণ অস্বীকার করে এই প্রথম আকাশে উড়ব। হঠাৎই আওয়াজ অনেকটা কমে গেলো। অভিজ্ঞতা না থাকলেও চট করেই আমার মনে হল কিছু সমস্যা আছে। এবং হলোও তাই, প্লেন থেমে গেলো।

এয়ার-হোস্টেজ মেয়েটি হাসিমুখে চমৎকার বাংলায় এসে জানালো, ' সম্মানিত যাত্রীবৃন্দ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আমরা কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি ঘোষণা করছি। অপেক্ষা করে আমাদের সহায়তা করার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের দুপুরটা সুন্দর হোক' ।

(৩)

বাংলাদেশের ডোমেস্টিক এয়ারলাইন্সের ওয়েটিং রুমটিতে স্মোকিং জোন নেই। সিগারেটের জন্য যাকে বলে পেট পুড়ছে। এমনিতেও কিছুদিন হয় সিগারেটের তৃপ্তি নিয়ে একটা আক্ষেপ চলে এসেছে। কারণ সিঙ্গাপুর থেকে আনা ব্র্যান্ড ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছি ইদানীং বাংলাদেশি একটা ব্রান্ড নিয়েছি যেটা দেশে থাকতে মন ভরে ফুঁকতাম, এখন কিনা সেটা পানসে লাগছে। অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারছি না আগে পাওয়া ব্রান্ডটার আমেজ। এর মধ্যে ওয়েটিং রুমটি এখন আর আগের মত নাই। মানুষের মাঝে উত্তেজনা ,উৎকণ্ঠা দুই কাজ করছে। মুখগুলোর নির্মল ভাব টা যেন হাওয়া হয়ে গেছে। ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথায় বোঝা যাচ্ছে প্লেনের সমস্যা গুরুতর। হয়ত ফ্লাইট বাতিল হবে। এক লম্বা চওড়া প্রৌঢ় বলছেন 'ঠিক হলেও তো উঠা উচিত না কারণ কি ধরনের যান্ত্রিক ত্রুটি তা তো প্লেন কর্তৃপক্ষ বলেনি। যদি মাঝ পথে আবার এমন হয়'! তার স্বর উঁচু এবং নেতৃত্ব স্থানীয়। মনে হচ্ছে এক সময় বড় সরকারী আমলা ছিলেন। কারণ একমাত্র রিটায়ার্ড সরকারি আমলাদের বয়স বাড়লেও ব্যক্তিত্ব আর আত্মবিশ্বাস না কমে বরং দ্বিগুণ হয়। লোকটার কথায় মানুষের অস্পষ্ট গুঞ্জন বাড়ে। তবে জটলাটা বেশিক্ষণ থাকে না। লোকজন আস্তে আস্তে যে যার মত আলাপ করতে করতে কম বেশি বসে পড়ে। রাহুল হঠাৎ এসে ধপ করে বসল,

-ভাইয়া ওরা বলছে লেট হবে,এবং দুপুর হয়ে গেলে লাঞ্চ ওরাই করাবে। কিন্তু ফ্লাইট ক্যান্সেল না। ঠিকঠাক করে একবার ট্রায়াল দিয়ে তারপর ফ্লাই করবে। আশেপাশের মানুষেরা যা বলছে সব রিউমার।

-চশমা পড়িয়ে সিগারেট খাওয়া যাবে।

-মনে হয় না। তাহলে বেরোতে হবে। একজন দুজনকে ঘুস দেয়া যায় কিন্তু এখানে তো অনেকগুলো চোখ। একজন বেরোলে কালার হয়ে যাবে না?

-হুম।

-আমি নিরীহ আবদার করে দেখি।

রাহুল উঠে যায় সার্ভিসিং এ কথা বলতে । সিগারেটের জন্য চট করে রাহুল কে ঘুসের কথাটা বলে ফেললাম। বেশ কিছুদিন হয় দুর্নীতির সাথে অভ্যাসে জড়িয়ে গেছি। আমার দুটো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চালাতে বেশ কিছু বিক্রয় কর্মী লাগে।

থাই বা চীনাদের সাথে কাজ করতে, আধো থাই আধো ইংরেজিতে কথা বলতে ভালো লাগে না আর আমি এদের সহ্য ও করতে পারি কম তাই বাংলাদেশ থেকে লোক নেই। ভিসার শর্ত অনুযায়ী এদের মাস্টার্স কোয়ালিফাইড হতে হয়।

কিন্তু অনেকেই মাস্টার্স থাকে না। বাংলাদেশে আমার কিছু লোক আছে যারা ভুয়া সার্টিফিকেট করে দেয় আর আমি অনায়াসে তাদের সিঙ্গাপুর নিয়ে আসি।

পণ্যের মধ্যে ভেজাল না মিশালেও, ভালো চালিয়ে দেই। কর্মচারীদের মাঝে মাঝে অহেতুক মালিকানা ভাব দেখাই। মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় ঘুস দেই। আসলে ঠিক দোকানী হওয়ার পর থেকেই দুর্নীতি আমার মজ্জাগত হয়ে গেছে।

রাহুল ফিরে এসে তার অপারগতাই জানায়। ওকে এখন আর বিরক্তির লাগছে না। আমাদের এয়ারলাইন্স থেকে যাত্রীদের টুকটাক খাবার দেয়া হচ্ছে কেক,জুস,বিস্কিট ইত্যাদি। সবাই কম বেশি ক্ষুধার্ত তাই আগ্রহ নিয়েই সবাই সেগুলো নিচ্ছে , আমিও নিলাম। রাহুল টুকটাক কথা বলছে আর আমি খাচ্ছি। ওর কিছু কথায় স্পষ্ট হিন্দু ধর্মের প্রতি তার প্রচণ্ড ঘৃণা শুধু নয়, সে ধর্ম বিরোধী এবং কমিউনিজম এর অন্ধ সমর্থক সে কথা কোনো ভাবেই গোপন থাকছিলো না। আমি বিশেষ আস্তিক নই।

ধর্মের প্রলেপ মেখে বসে থাকি না কিংবা ধর্ম চিন্তা আমাকে বুদ করে না কিন্তু নাস্তিক ব্যাপারটা তেমন নিতে পারি না। হিন্দু ধর্মের গঠনগত দিক আমাকেও ভাবায় তবে ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার স্বভাবগত। একা একা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি অনেক।

ডিজ্যাঁভুর সময় ঈশ্বরকে ছেলেমানুষি চিঠিও লিখি। আমি রাহুলের কথায় তাল, বেতাল কিছুই দেই না।

ওর কথার সংক্ষিপ্ত বিরতিগুলোতে তারপরের আদলে ছোট্ট ছোট্ট হুম ছুঁড়ে দিয়ে খাওয়া শেষ করি।

প্লেনে উঠে ভেবেছিলাম এই তো আর কিছুক্ষণ আমি চোখ বন্ধ করে এই ডিজ্যাভুর পরিমণ্ডল থেকে বের হয়ে যাব। কিন্তু প্রকৃতির এমন পরিকল্পনায় আমি আরো হতাশ বোধ করছি। মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এলো,

-শালা জেলে এসেছি।

আমার কথায় রাহুল খুব হাসল।

-ভাইয়ার কি খুব খারাপ লাগছে সিগারেটের জন্য?থ্যাঙ্ক গড আমি সিগারেট খাই না। প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না। তবে আমাকে অবাক করে দিয়ে রাহুল বলল, কবিতা শুনবে? জেল নিয়ে নাজিম হিকমতের রিলেটিভিটি ঘেঁষা একটা কবিতা আছে। এই সেদিনই মাত্র গলায় তুললাম। বলে, সে জড়তাহীন আবৃত্তি শুরু করে দিল-
জেলে এলাম সেই কবে

তার পর গুনে গুনে দশবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে
পৃথিবী।

পৃথিবীকে যদি বলো,বলবে-
'কিছুই নয়,
অণুমাত্র কাল
আমি বলব-
'না, আমার জীবনের দশটা বছর' ।
আরো বড় পুরোটা শুনবে?
-হুম।
২
যে বছর জেলে এলাম
একটা পেন্সিল ছিল
লিখে লিখে খইয়ে ফেলতে এ হপ্তাও লাগে নি।
পেন্সিলকে জিজ্ঞেস করলে বলবে;
'একটা গোটা জীবন'
আমি বলব:
'এমন আর কী, মোটে তো একটা সপ্তাহ।'

খুব জোরে না আবার আস্তেও না, এমনই একটু চাপা, তবু চমৎকার স্বরে আবৃতি করে যাচ্ছে রাহুল। এই কবিতাটি আগেও কবি বন্ধুদের কাছে শুনেছি আজ অনেকদিন পর কবিতাটির ভাব খুব করে মনে ধরল। রাহুলের আবৃত্তিতে সতর্কতার চেয়ে আবেগই বেশি । এই ছেলেটাকে কিনা আমি এতদিন ডুড খেতাব দিয়েছিলাম মনে মনে। আমার দোকানী চোখ এখন দ্রব্যই চিনে, মানুষ চিনতে পারে না। আমি কবিতার ভেতরে একেবারে ডুবে গেলাম, আনমনে সরে গেলাম ওয়েটিং রুম থেকে।কবিতাটি শেষ হলো,আর আমার এই ডুবে যাওয়া মন আবার ভেসে উঠল সেই কাজল মায়া মাখানো মুখে। মেয়েটি সাথের ছেলেটির সাথে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছে, একটু হাসছে। এই চাউনি আর হাসি খুব দেখেছি এ জনমে নয় যেন হয়ত পাঁচশ বছর আগে। আমার অনুভূতিটা জীবনানন্দের সেই কবিতাটির মতো 'কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি

কবে যেন রাখিয়াছি হাত তার হাতে কবে যেন তারপর শ্মশান চিতায় তার হাড়
ঝড়ে গেছে কবে যেন, এ জনমে নয় যেন এই পাড়া-গাঁর
পথে তবু তিনশো বছর আগে হয়তো বা আমি তার সাথে
কাটিয়েছি পাঁচশো বছর আগে হয়তোবা সাতশো বছর...

কি অদ্ভুত রকম মিলে গেলো কবিতাটি। মনে হচ্ছে জীবন বাবু ডিজ্যাঁভু নিয়েই কবিতাটি লিখেছে কিংবা তিনি কি নিজেকে জাতিস্মর ভাবতেন?

(৪)

যে গাড়ি করে প্লেন পর্যন্ত এসেছিলাম, সে গাড়ী করেই আবার ফিরে যাচ্ছি ওয়েটিং রুমে। পিয়াল একেবারে চুপ হয়ে গেছে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি ওর মন খারাপ। সব মানুষই হয়ত এখন অনিশ্চয়তায় ভুগছে। মামা পাশের লোকটির সাথে কথা বলছেন। সময়মত যেতে না পারায় লোকটির নাকি বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো। লোকটা হঠাৎ একটু জোড়ে বলে উঠল, 'ফালতু এয়ারলাইন্স যত্তোসব' । মামা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে তাকালো। ড্রাইভার শুনতে পেলো কিনা বুঝা গেলো না তবে সামনের দিক থেকে সেই ধুসর কোর্ট পড়া ভদ্রলোক ফিরে তাকালো ।

ভ্রু-জোড়া ভীষণ রকম কুচকে আছে। আমার এখন মনে হচ্ছে লোকটার সুন্দর চেহারাই আমাকে টানছে আর কিছু নয়। কিংবা এমন লোককেই আমি সুন্দর ভাবি বা আমার ভালোলাগার প্রতিরূপ লোকটি। তা না হলে আমি কি লোকটাকে চিনি? কি জানি কেমন লোক। আমি অবাধ্য চোখ ফেরাই।

আবার সেই ওয়েটিং রুম। এখন মনে হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ এখানে থাকতে হবে। বসে বসে মানুষের মুখ দেখা ছাড়া কাজ নাই। সামনে একটা টিভি আছে ঠিকই তবে এখান থেকে কথা বুঝা যাচ্ছে না। বোবা বাক্স দেখতে ভালো লাগল না।
এখন অনেকের মুখই মুখস্থ হয়ে যাবে রাস্তা ঘাটে দেখলে মনে হবে আরে!আমরা তো একই ওয়েটিং রুমে ছিলাম। আবার ফিরে এসে আমাদের ফ্লাইটের লোকজন যেন মানসিক প্রস্তুতির সাথে সাথে শরীরও ছেড়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে তারা ধরেই নিয়েছে অনেক দেরী হবে।
মানুষগুলোর ভদ্রতার মোড়ক কিছুটা খুলে গেছে। অনাকাঙ্ক্ষিত অপেক্ষা মানুষকে ঠিক অভদ্র করে না তবে ভদ্রতা কিছুক্ষণের জন্য হলেও ম্লান করে দেয়। তাই প্রমাণ করল অনেকের চাপা গালি আর বিড়বিড় করে বলে উঠা অস্পষ্ট শব্দ। আশেপাশের অনেকের মুখেই হতাশা আর ক্ষোভ। আমার নিজের চেহারাও দেখতে ইচ্ছে হলো।
-জুই! খিদে পেয়েছে না? এই দেখ খাবার এসে গেছে। পিয়াল বাবা দেখো তোমার প্রিয় জুস। মামার কথায় ফিরে তাকিয়ে দেখি এয়ারলাইন্সের লোকগুলো খাবার নিয়ে এসেছে কিছু। আমাদের ক্ষুধার্ত রাখতে হবে না দেখে মামার খুশি চোখে পড়ার মত। আমাদের প্রতি মামার টান সব সময়ই বাড়তি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তা চৌগুণ। এগুলো আমার পছন্দ নয় তবে আমি মামাকে খুশি করতে অতি উৎসাহে খাওয়া শুরু করলাম। কিন্তু পিয়াল এখনো চুপচাপ। ওকে আমার একটু অস্বাভাবিক লাগছে। মামা পিয়ালের হাতে জুস আর কেক ধরিয়ে দিল,
-খাও বাবা।
-বমি আসছে।
-ঠিক আছে খেয়ে বমি কর। মামা পিয়ালের মাথায় হাত রাখেন। আমাকে বলেন,
-জুই। তুই লোকগুলোর কাছ থেকে পানিগুলো নে তো।
-ঠিক আছে ।মামা পিয়াল তো মনে হয় অসুস্থ হয়ে যাবে তেমন কিছু খেয়ে আসে নি কিন্তু এখনো খাচ্ছে না।
-আরে না না খাবে না কেন? মামা প্রায় চিৎকার করে উঠেন, পিয়ালকে নিজে খাইয়ে দিতে থাকেন।
এর মধ্যে আশেপাশের মানুষের মাঝে জোর গুঞ্জন উঠল, প্লেনে বিরাট সমস্যা। তারা বলছে আসলে এই প্লেনগুলো সেকেন্ডহ্যান্ড, প্রাইভেট এয়ারলাইন্সগুলো আসলেই খারাপ। এক লোক বিমান বাংলাদেশ কে উদ্দেশ্য করেও বেশ কিছু কথা বলছে যার সারমর্মে তার উক্তি 'আর ডোমেস্টিক বিমান বাংলাদেশ তো বিরাট খেয়ালি কবি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। এদের টিকিট যেমন সস্তা, তেমন ঈদের চাঁদ। সার্ভিসিং এ কাঁচকলা' । পিয়াল কান খাড়া করে প্লেন সংক্রান্ত সব কিছু শুনছে। ওর চুপচাপ থাকার কারণ আমি এখন বুঝতে পারছি। ও আসলে ভয় পেয়েছে। আমার ধারনা সত্য করে ও খেতে খেতে মামাকে প্রশ্ন করে,
-আচ্ছা প্লেন কি নষ্ট হলে ক্রাশ করে। টিভিতে যেমন দেখি। তাহলে তো সবাই মারা যাবে।
-আরে না না।প্লেন নষ্ট হয় নি তো। না রে জুই?প্লেনে তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল।
-হ্যাঁ তাই তো।

আমি আর মামা পিয়ালকে বুঝাতে থাকি। কিন্তু বুঝানো বেশিদূর এগোয় না। কারণ পিয়ালের অমনোযোগিতা আমাদের সাত পাঁচ বুঝকে অস্বীকারই করে। পিয়ালের বয়স এখন এগারো, বুঝ নেয়ার বয়স এখন আর তার নেই। তার নিজস্ব চিন্তা আছে। তবু আমি হাল ছাড়ি না নানা কথা বলে ওর মনোযোগ ঘুরাতে চেষ্টা করি। আমার ওর জন্য খারাপ লাগতে থাকে। এত উৎসাহ ছিল বেচারার এখন চেহারার দিকে তাকালে মায়া লাগছে।

পিয়াল আমার সাথে কথা বলায় আগ্রহ দেখাল না। হঠাৎ বলে উঠল,
-মাকে ফোন করব।

মামা ওকে মার সাথে কথা বলায়। পিয়াল ফোনটা নিয়ে হেটে হেটে কথা বলতে থাকল। মামা ওর পাশে থাকেন। পিয়ালের দিকে তাকাতে তাকাতে লোকটার দিকে চোখ গেল। এখন তারা আর আমাদের পাশের ছিটে না, একটু পেছনে কিন্তু দূরত্ব তেমন না। বরাবর না হওয়ায় আমি যে তাকে দেখছি এটা তার চট করে চোখে পড়বে না। পাশের লোকটি কথা বলছে, লোকটি শুনছে আর খাচ্ছে। সে তার কোর্ট খুলে ফেলেছে। ঝকঝকে সাদা সার্টে আরো সুদর্শন লাগছে তাকে। ভদ্রলোক মুচকি হাসলে থুতনির টোলের কারণে পুরো চেহারায় এক অদ্ভুত মিষ্টতা ছড়িয়ে গেলো। হাসিটা সে বেশিক্ষণ গালে ধরে রাখল না, কেমন করে যেন আস্তে করে মিলিয়ে দিল। বেশ কিছুক্ষণ ই তাকিয়ে রইলাম হয়ত। হুশ হতেই চোখ ফেরালাম। এখন আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে আর আমি কিনা এতদিনে অপরিচিত এক যুবককে দেখে মুগ্ধ বোধ করছি!আমি বোবা টিভিতে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্য কিছু ভাবতে চাই, ভাবতে থাকি।

বেশ কিছুক্ষণ পর পিয়াল ফিরে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল।আমিও ওর হাত দুটো ধরে বলি,
-ভাইয়া টয়লেটে যাবে?

-হুম। আপু আমার বমি আসছে।
-কি বল? এখনো বমি আসছে?
-হুম।

পিয়াল মুখে হাত দিয়ে উগরে আসা বমি ঠেকাতে চাইলো। মামা একটু সামনে লোকদের সাথে কথা বলছে। আমি ওকে টয়লেটে নিয়ে যেতে যেতে আর মামাকে ডাকতে ডাকতে পিয়াল ওয়েটিং রুমের মেঝেতেই বমি করে দিল। অনেক মানুষ ছুটে আসছে, আমি আমার ভাইকে জড়িয়ে ধরে আছি। কি করব বুঝতে পারছি না।

(৫)
জানিসই তো আমাদের ধর্মে আগের জন্মের কথা যাদের মনে থাকে কিংবা যারা আমার মত এমন ধাঁধায় পড়ে, তাদের জাতিস্মর বলে। আমি জাতিস্মর কিনা জানিনা তবে অনুভূতিটা এমনি।
-মানে তুমি কি বলছ তুমি জাতিস্মর?রাহুলের মুখ বিস্ময়ে হা হয়ে আছে।
-নাহ!জাতিস্মর ভেবে নিজেকে আলাদা ভাবা বা ফাঁপা আত্মবিশ্বাসে ডুবতে পারলে ভালই হত হয়ত, পারিনা। ডাক্তারি বিদ্যায় এটা ডিজ্যাঁভু যার আভিধানিক অর্থ 'অলরেডি সিন'। বাঙ্গালা করলে আরো অদ্ভুত মানে, ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছি।হা হা!
আমি হাসছি। গল্পের বৃদ্ধ নাবিকের মত রাহুলকে নিজের ব্যক্তিগত কথা বলছি। রাহুলকে বেশ ভালো লেগেছে তাই নিজের কথায় নিজের কানে কোন জড়তা খুঁজে পেলাম না। কেমন করে কোন কথার ফাকে যেন নিজের ভেতর বৃদ্ধ নাবিক উকি দিল। রাহুল আমার আরো কাছ ঘেঁষে বলে,
-তুমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওনি? রাহুলের মুখ আগের মতই,
-হুম। আমার প্রথম ডিজ্যাঁভু হয় দু বছর আগে। বসন্তের এক বিকেলে। আমি জুরং বার্ড-পার্কে ফ্লেমিঙ্গো কর্নারে ছিলাম। এক বৃদ্ধা তার নাতনীকে চকোলেট দিচ্ছে। ব্যাস আমার মনে হলো এটা একটা পুরোনো দৃশ্য আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না নিজের অনুভূতিকে। আর প্রথমবার তাই বিস্ময় এর ধাক্কাটাও খুব বড় ছিল। বেশ অনেকদিন আমি সেই আবেশ থেকে বের হতে পারিনি। তারপর একদিন আমার ডিপার্টমেন্টে। দ্বিতীয় বারের ঘটনাটা অনেকক্ষণের জন্য ছিল, কিছুদিন আর ঠিকমত অফিস করতে পারলাম না। কোন কাজ ভালো লাগত না। সি সি ক্যামেরার সামনে বসে দোকান চালানো আর টাকা গোনার জীবন যে কি নিরর্থক তা হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। তারপর প্রায়ই ঘটে এমন ঘটনা। কিছুদিন যেতে আমি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাই। উনি আমার জীবনবৃত্তান্ত শুনেন। তারপর মিঃ থাপা চমৎকার ইংরেজিতে আমাকে যে ব্যাখ্যা দেন তা হলো। আমি ডিজ্যাঁভু ডিসঅর্ডারে ভুগছি। বিভিন্ন ব্যাখ্যা আর হাল্কা ঔষধে তিনি রোগটাকে প্রায় ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু সেটা উড়লো না, আরো বসে গেলো। এর পর বেশ কিছুদিন পর পর আমি উনার কাছে যাই। আস্তে আস্তে আরো আলোচনায় উনি বলেন, রোগটা নিয়ে অনেক হাইপোথেসিস আছে।
-যেমন?
-দুটো মনে আছে শুধু। যেমন ফ্রয়েড, উনি তো স্বপ্ন বিশারদ। উনার মতে, কোন একটা স্বপ্ন বার বার আর গভীর অনুভবের কারণে বাস্তবের সাথে ঘুলিয়ে যায় তখন এমন মনে হয়। আর হ্যাঁ সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট হাইপোথেসিস হলো মেমরি সেন্টারের কর্মকাণ্ডের গণ্ডগোল।
-মানে? খুব ইন্টারেস্টিং তো!গণ্ডগোলটা বুঝিয়ে বলো।
-আমি তেমন ভালো বলতে পারব না।উনি আমাকে একটা ছক এঁকে বুঝালেন কীভাবে মেমোরি স্টোর হয়। প্রথম কাউকে দেখলে তা শর্ট টার্ম মেমোরিতে যায়।আর লংটার্ম মেমোরি চারটা স্টেপে সেটল হয়। রিকগনিশন মানে কাউকে দেখা বা চিনা, রেজিস্টার মানে তাকে মনে রাখা, রিহার্সাল মানে প্রায় দেখা বা ভাবা আর রি-কল মানে তাকে চাইলেই মনে করতে পারা। এই ভাবে শর্ট টার্ম মেমোরি থেকে লং টার্ম ডেভেলপ করে । এখন কাউকে প্রথম দেখলে তা শর্ট টার্ম মেমোরিতেই যাবে। কিন্তু কাউকে প্রথম দেখি আর ব্রেন যদি তাকে লং টার্মে নিয়ে যায় তবে এই সিস্টেমটাকে বলে ওভারল্যাপ। আর এই ওভারল্যাপ হলেই ডিজ্যাঁভু।

রাহুল কিছু বুঝলো কি না বুঝতে পারলাম না। তবে কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে আবার প্রশ্ন করল, -তোমার কি এখন মনে হচ্ছে যে... রাহুল কথাটা শেষ করেনা। তবে তার বোকা বোকা কথার আড়ালের বুদ্ধিমত্তায় কিছুটা চমকে যাই।

-হুম। মিঃ থাপার বিশ্লেষণ শুনে ভেবেছিলাম ধুর এটা একটা বিষয় হলো। আমি তো বুঝতেই পারলাম ব্যাপারটা, মেমোরি সিস্টেমের কাঁথা পুড়ি। কিন্তু কিছুদিন যেতেই যেই সেই। এতকিছু জেনেও একই রকম বোধ করি।
-হুম। এটার সাইড এফেক্ট কি?

-ডিপ্রেশন। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ডিপ্রেশন।
-তুমি কি এখন ডিপ্রেসড ফিল করছ? ভাইয়া, আমি আছি না এখন, আমি তোমাকে ডিপ্রেসড থাকতে দেবো না।

রাহুল আমাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ছেলে ওর চোখ মুখ অন্যরকম হয়ে গেছে। নিজের আবেগ কমার পাশাপাশি অন্যের আবেগেও অস্বস্তি হয়। আমি হালকা ভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলাম। হঠাৎ একটু শোরগোল ওঠে। নীল জামা পড়া মেয়েটির সঙ্গের ছোট ছেলেটি বমি করেছে। সাথের ভদ্রলোকের মুখে আতংক। কিছু মানুষ ধরাধরি করে ছেলেটিকে নিয়ে যাচ্ছে ওয়াশ রুমে। রাহুল ও এগিয়ে গেলো। আমি উঠলাম না। ছেলেটির জন্য খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু এগিয়ে না যেতে না পারাটাই আমার স্বভাব। খারাপ লাগাগুলোও কাছ থেকে এক রকম সহ্য হয় না।
ওরা ওয়াশ রুম থেকে ফিরে এসে বসল। মেয়েটি কাঁদছে ছোট ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে মাঝ বয়সী ভদ্রলোকের কোলে মাথা রেখে কি যেন বলছে। তাদের ঘিরে এখনো কিছু মানুষের অর্ধবৃত্ত। রাহুল এসে জানালো ছেলেটা নাকি যেতে চাচ্ছে না। সে ভয় পেয়েছে। আমি আমাকে লেখা চিঠির উপদেশ অমান্য করে মেয়েটির কান্না ভেজা মুখ দেখতে থাকি, যতক্ষণ দেখা যায়। রাহুল আমাকে নানান কথায় ব্যস্ত রাখতে চাইছে আমি বুঝতে পারি। কিন্তু হঠাৎ ই আমি নিরুত্তর হয়ে ওর চেষ্টায় পা পিছাই। আস্তে আস্তে ওর কথা কমে যায়।

ইতিমধ্যে আমাদের এয়ারলাইন্স তৈরি হয়ে আমাদের জানায়। আমরা তৈরি হচ্ছি। মেয়েটি আর সাথের লোকটি এখনো ছেলেটিকে বুঝাচ্ছে হয়তো। তারা বসেই আছে। আমি ওয়েটিংরুম ছেড়ে বের হয়ে যাচ্ছি মেয়েটিকে দেখতে দেখতে কী মায়াময় মুখ! চলতে চলতে মুখটি আড়াল হয়ে গেল। বুকটা হাল্কা মোচড় দিল। খুব পুরোনো অনুভূতি। মনে হচ্ছে মেয়েটির এই মুখ পেছনে ফেলে আমি অনেক আগেই এসেছি, 'এ জনমে নয় যেন হয়ত পাঁচশো বছর আগে।'

……………………………..

গল্প

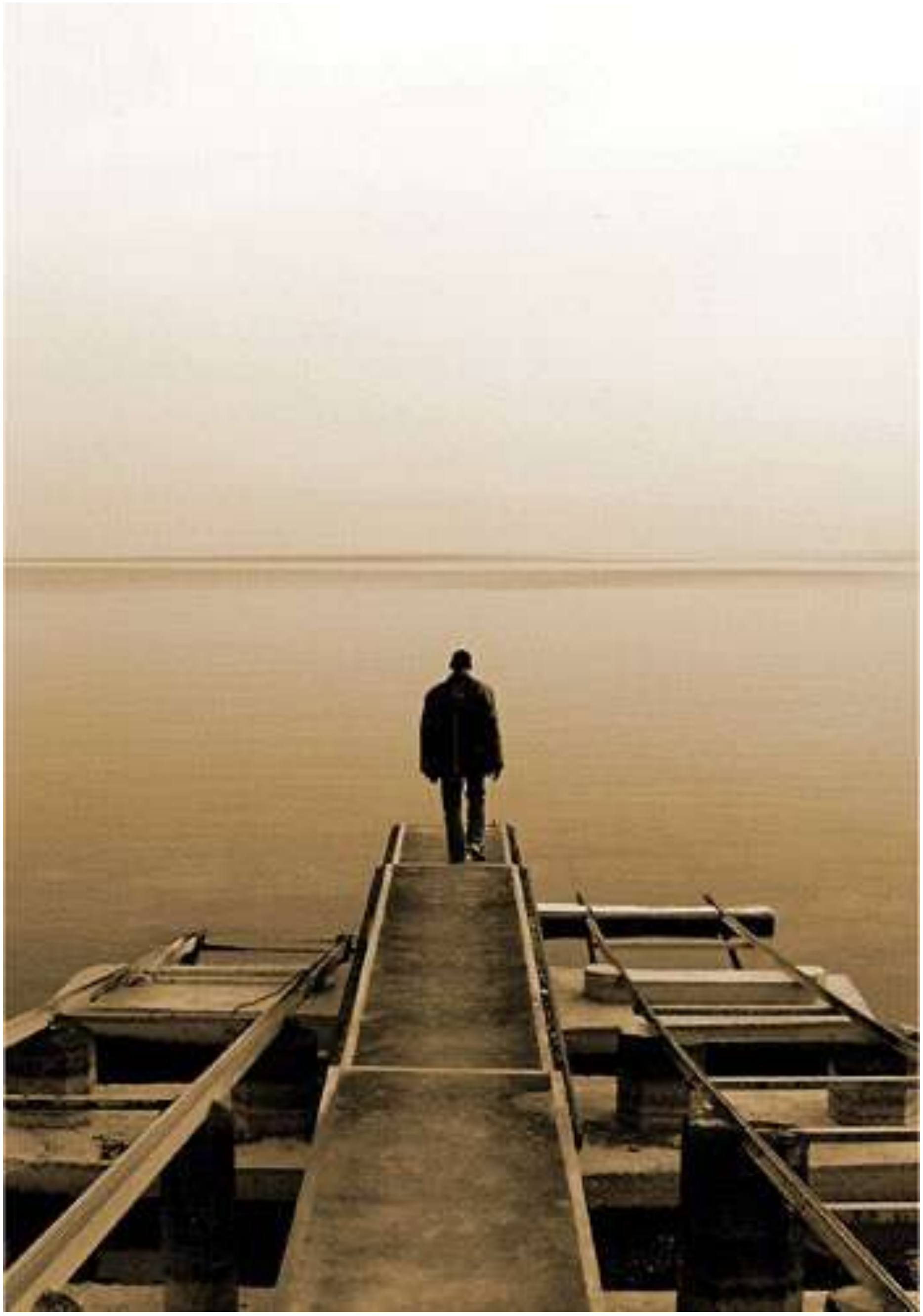

জগতে কে কাহার

শৈলার জুলিয়ান সিদ্দিকী

"....ফিরিয়া দেখি আমার এতকালের প্রিয় আর পরিচিত দেহ খানা কালো-কৃষ্ণ সড়কের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মনে হইতেছিল যেন দেহটি খানিকটা কাত হইয়া আকাশের দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া কিছু একটার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপণ করিতেছে....."

গল্প

১

বাকালা অর্থাৎ দোকান হইতে সবজি খরিদ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়া প্রধান সড়ক পার হইবার কালে অকস্মাৎ কিসের ধাক্কা লাগিয়া তৎক্ষণাৎ আমি ভূমিসাৎ হইলে সমুদয় জগত যেন মুহূর্তকালের লাগিয়া অনন্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া গেল। কিয়ৎকাল পর অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ কাটাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হইলেও সাতিশয় আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিলাম যে, নিজেকে কেমন যেন বায়বীয় আর হালকা পলকা মনে হইতেছিল। ফিরিয়া দেখি আমার এতকালের প্রিয় আর পরিচিত দেহ খানা কালো-কৃষ্ণ সড়কের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মনে হইতেছিল যেন দেহটি খানিকটা কাত হইয়া আকাশের দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া কিছু একটার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপণ করিতেছে। পাশেই একটি পুরাতন জিএমজি গাড়ি দণ্ডায়মান দেখিতে পাইয়া আমি নিশ্চিত হই যে, সৌদি লোকটিই হয়তো আমার দেহটিকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিল। এই মুহূর্তে যেই ব্যক্তিই আমার নিথর আর রক্তাক্ত দেহটি অবলোকন করিবে, সেই বলিবে এই আজনবি লোকটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে।

আহা, বাঙালি মিসকিন, দেশে স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন রাখিয়া অধিক উপার্জনের প্রত্যাশায় হয়তো ঘর-বাড়ি জমি-জিরাত বিক্রি করিয়া এই দেশে আসিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার সমুদয় স্তিমিত হইয়া গিয়াছে একটি মূর্খের সামান্য ভুলের তরে। ইহারই নাম ভাগ্য। আর জগতও এমনই এক বিচিত্র স্থান, কাহার মৃত্যু কোথায় ঘটিবে বা নির্ধারিত হইয়া আছে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

আমি আমার নিথর দেহটির প্রতি তাকাইয়া তৎকালীন অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম আর অবাক হইয়া ভাবিতেছিলাম যে,

শৈলার : জুলিয়ান সিদ্দিকী

নিজের সম্পর্কে: আমি বেশ কৌতুহলী। মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ বেশি। মানষের ভেতরকার মানুষটিবে জানতে অনেক সময় ব্যয় করে ফেলি। চেষ্টা করি তা লেখায় ফুটিয়ে তুলতে। ঘৃণা করি রাজাকার, কপট সানুষদের।
ভালবাসেন: অনেক কিছু। পরিবার-পরিজন, দেশ, তার প্রকৃতি।
প্রিয় ব্যক্তিত্ব: আমার বাবা। আমার শিক্ষক ও দার্শনিক সিদ্দিকুর রহমান।
অবসরে: ঘুমাই।

আমার দেহে কত লিটার রক্ত ছিল? মাথার নিচ হইতে রক্তের একটি ধারা কালো সড়কের শরীর বাহিয়া পাশের ধুলাকেও কেমন কালিমা মণ্ডিত আর কালচে করিয়া দিয়াছে। আমার হাতের পলিথিনের ব্যাগে টমেটো, বরবটি, লেবু, দুইটা পেঁয়াজ, একটি রশুন আর কাঁচা মরিচ ছিল। দীর্ঘদিন ধরিয়া এখান হইতে সবজি খরিদ করি বলিয়া মাঝে মধ্যে বাকালার লোকটি দুটি একটি কমলা বা মাল্টা, কখনো বা একটি আপেল সবজির সঙ্গে দিয়া ব্যাগে তুলিয়ো দেয়।

আজও একটি মাল্টা হয়তো দিয়াছিল আমার অগোচরে। সবই ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়িয়া আছে সড়কের উপর। চাহিয়া দেখিলাম সেইগুলার অধিকাংশই অন্যান্য চলমান গাড়ির চাকায় পিষ্ট হইয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ঠিক তখনই গাড়িটির দরজা খুলিয়া গেল। একজন সৌদি নাগরিক বাহির হইয়া আসিয়া মৃত দেহটির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া চোখ-মুখ বিকৃত করিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, আনা মাফি মসুল। মাফি মসুল আনা! মোখ মাফি আজনবি লেশ ইজি কিদা? আনা মাফি মসুল। হাদা মিসকিন গলতান!

একই রকম বিড়বিড় করিতে করিতে লোকটি তোপ বা কুর্তার পকেট হইতে একটি ব্ল্যাক-বেরি বাহির করিয়া কাহারো উদ্দেশ্যে নাম্বার টিপিতে লাগিল।

বাকালায় আসা-যাওয়া করিবার বেলা সর্বদা আগে পিছে দেখিয়া রাস্তা পারাপারের অভ্যাস আমার। এই দেশের মানুষ পদব্রজে কোথাও গমনাগমন করে না। আর করিলেও তাহা গৃহ সন্নিকট বর্তী মসজিদ বা হাঁট-বাকালা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেখানে রাস্তায় সচরাচর গাড়ি চলাচল করে না।

কিন্তু আমার মত আজনবিদিগের সকলের গাড়ি থাকে না। গাড়ি রাখিবার সামর্থ্য সকল আজনবির হয় না। কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনে তাহাদের বেশ কিছুটা পথ পায়ে চলিয়া পাড়ি দিতে হয়। আমিও প্রায় সময় সবজি খরিদ করিবার নিমিত্ত এই বাকালাটিতে আসি। কোম্পানি প্রদত্ত আবাসিক স্থাপনা যেখানে, তাহার দূরত্ব এখান হইতে কম করিয়া হইলেও দুই কিলো মিটারের পথ। আর এই পথটুকু আমাকে পদব্রজে অতিক্রম করিতে হয়। ইতোপূর্বে আমি এতটা অন্যমনস্ক হইয়া কদাপি পথ চলি নাই। অথবা এই লোকটির মত বিনা সংকেতে কেহ রাস্তায় গাড়ি চালায় বলিয়াও লক্ষ্য করি নাই।

আমি না হয় অন্যমনস্ক ছিলাম। গাড়ি চালাইবার কালে লোকটিও কি অন্যমনস্ক ছিল? নয়তো সে হর্ন বাজাইয়া আমাকে সতর্ক করিতে পারিত। কোনো প্রকার যান্ত্রিক শব্দ আমার কর্ণ গোচর হইলেও নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরাইয়া নিতে পারিতাম।

লোকটি হয়তো পুলিশকেই ফোন করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে একটি পুলিশের গাড়ি আসিয়া থামিলে তাহা হইতে দুইজন পুলিশ সদস্য নামিয়া আসিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা আমার দেহটি দেখিয়া একজন গাড়ির দরজা খুলিয়া নিচু স্বরে রেডিওতে কিছুক্ষণ কথা বলিল। তাহার আরো কিয়ৎকাল বাদে একটি অ্যাম্বুলেন্স আসিয়া থামিলে তাহা হইতে দুইজন লোক স্ট্রেচার নিয়া নামিল। স্ট্রেচারটি ঝটপট নিচে নামাইয়া আমার দেহটিকে দুইজনে ধরাধরি করিয়া স্ট্রেচারে ফেলিয়া অ্যাম্বুলেন্সে তুলিয়া দিলে আমিও দেহটির পাশে গিয়া বসিলাম।

২

দেশে থাকিতে স্ত্রী-সন্তানের ভরন-পোষণের ব্যয় মিটাইতে আমাকে দিন রাত কাজ করিতে হইত। দিনের বেলা কায়িক শ্রম। রাতের বেলা নিদ্রা যাইবার ছলে বিছানায় শুইয়া শুইয়া মস্তিষ্কের কাজ। অর্থাৎ অকাজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কত না রজনী ফুরাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অভাবের সংসারে নিত্য টানাটানি কিছুটা থাকিলেও পিউর সঙ্গে খিটিমিটি ছিল না তেমন একটা। তবু অনুভব করিতে পারিতাম যে, কোথাও কোনো আড়ালে যেন একটা অশান্তির ঘুঘু একটানা উঁহু উঁহু করিয়া কাঁদিয়া চলিয়াছে। মনে হইত পিউকে সুখী করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতের সংস্থান কিছু হইল না। যে কারণে জীবদ্দশায় সন্তানগুলাকেও হয়তো মানুষ করিয়া যাইতে পারিব না।

এবম্বিধ ভাবনার অবিরাম বুদবুদের কারণে আমার মনে নিত্য অশান্তি বিরাজ করিত বলিয়া আশপাশে সকলের চেহারায় দেখিতে পাইতাম তাহারই ধূসর প্রচ্ছায়া। আর তাহারই বিরূপ প্রভাবে বোধকরি সেইবার জাসিনের সঙ্গে ছোটখাটো একটা ঝগড়া হইয়া গেল। ভাবিতে গেলে ব্যাপারটা তেমন গুরুতর কিছু না বলিয়াও প্রতিপন্ন হইতে পারে। জাসিনের ডান কানের লতিতে হালকা লালচে দাগ দেখিয়া একদিন বলিয়া উঠিয়াছিলাম, কি, আজকাল খুব সোহাগ পাচ্ছেন বুঝি?

কিন্তু যাহার নিকট গুরুতর তাহার দৃষ্টিতে একটা তিলও সমস্যা আর যাহার কাছে গুরুত্ব নাই, গালে গভীর ক্ষত থাকিলেও সেই স্থানে চুম্বন করিতে তাহার মনের ভিতর বিন্দুমাত্র দ্বিধার জন্ম হয় না।
আমার জানা ছিল না যে, তাহার আর অভিজিতের মাঝে বনিবনা নাই দীর্ঘদিন। অভিজিত প্রায়ই বাড়ি ফিরে না। একদিন জাসিন হাতে নাতেই তাহাকে তিতিরের সহিত একই রিকশায় ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরিয়া ফেলিল। যাহা আমি জানিতে পাইয়াছিলাম ঝগড়ার ঘটনার বেশ কিছুদিন পর।

কিন্তু ইহার পূর্বেই জাসিনের মুখ নিঃসৃত অসভ্য, ইতর, ছোটো লোক, পরশ্রীকাতর ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যবাণে আহত হইয়া তাহার মুখ দেখা বন্ধ করিয়াছিলাম। যাহা পূর্ণতা পাইয়াছিল চাকরি ছাড়িয়া দেওয়ার মাধ্যমে।

অফিস বদল করিলেও আমার নিয়তি বা ভাগ্য আমার পিছু ছাড়িল না। নতুন আরেকটি কোম্পানিতে জয়েন করিলেও তাহারা আমাকে আমার চাহিদা মতন বেতন দিতে সম্মত হইল না। আমি বলিতেও পারি না, এখানে চাকরি করবো না!

এই পর্যন্ত কম চাকুরী তো আর করিলাম না। কোম্পানিও কম বদল হইল না। মনে মনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছি যে, এই দেশে থাকিতে আর চাকরি বদল নহে। এই চাকরি ছাড়িতে বাধ্য হইলে নতুন চাকরির জন্য দেশের বাহিরে কোনো দেশে চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে মনের ইচ্ছা মনের ভিতরই ঘুমাইয়া থাকে। ইচ্ছাটা কদাচ ঘুমের ভিতর পাশ ফিরিলেই তখন মনটা খচখচ করিয়া উঠিত।

অস্থিরতা কাটাইতে পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রকারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে দৃষ্টি বুলাইতাম।

এরই মধ্যে একদিন শাশুড়ি কন্যা আর নাতি-নাতনী দর্শনে আসিয়া কথায় কথায় আমাকে বলিলেন, বাজান, কত্ত মানুষ বিদেশ যায়, আমনে কি চেষ্টা-তদবির করেন না?

তখনই পিউ শ্লেষ মাখা কণ্ঠে কহিয়া উঠিয়াছিল, আর বিদেশ! পকেটে নাই চাইর আনা, এমন মানুষরে কইতাছেন বিদেশ যাওনের চেষ্টার কথা!

পইসার লাইগ্যা কি আর বিদেশ যাওন ঠেইক্যা থাকবো? কন্যার ঠেস লাগানো কথার পিঠে জামাতাকে নিজের সক্ষমতার খানিকটা আভাসও যেন দিলেন তিনি। তারপর আমাকে সাহস যোগাইতেই হয়তো পুনর্বার বলিয়া উঠিয়াছিলেন, বাজান, চিন্তা-ভাবনা না কইরা আমনে চেষ্টা করেন, ট্যাহার ব্যবস্থা হইবো!

টাকার ব্যবস্থা তো হইয়াছে। আমার চেষ্টাও ফলবতী হইয়াছে। কিন্তু পিউর জ্যেষ্ঠ ভগিনী মলিনার স্বামী হারুন নাকি মাঝে মাঝে বলেন যে, তিনি বিদেশে গেলে কাহারো চ্যাট ধরিয়া যাইতে হইবে না। আমি সকলই বুঝিতে পারি। কথা তো ভদ্রলোক মিথ্যা বলেন নাই।

আমি যে শ্বশুর কূলের চ্যাট অবলম্বন করিয়া ভিসা-টিকেটের অধিকারী হইয়াছিলাম ইহার চাইতে বড় সত্য আমার জীবনে কী আর আছে!

সময় এমনই এক নিষ্ঠুর চরিত্র যে, তাহার কোপ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে এমন কেহ অদ্যাবধি কোনো জননীর গর্ভে আগমন করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই।
এখন পিউ বা আমার পিতার সংসারের সদস্যরা আমার মৃত্যুর সংবাদ জানিলে যাহারা উল্লসিত হইবে না, তাহারা নিশ্চয় আক্ষেপ করিয়া শাশুড়ির উপর দোষারোপ করিবে। তিনি টাকার যোগান না দিলেই তো আমি প্রবাসে আসিতে পারিতাম না। প্রবাসে না আসিলে হয়তো বা এমন বেঘোরে আমার অকাল মৃত্যুও হইত না।

৩
হিমঘরে আমার দেহটির পাশে আরেকটি দেহ শায়িত ছিল। দেখিয়া মনে হয় লোকটি ভারতীয়। কেরালা বা তামিল নাড়ুর বলিয়া বোধ হইতেছিল। বয়স আমার চাইতে কিঞ্চিত অধিক হইবে।
হিমঘরে বেশ শীত বোধ হইতেছিল। মৃত বলিয়া আমি এখন অশরীরী। আর সেই কারণেই আমি বস্ত্র ধারণ করিতে অক্ষম। তবে শীত নিবারণার্থে বেশ কয়েকবার হিম যন্ত্রের উত্তপ্ত ধাতব আচ্ছাদনের উপর আরোহণ করিয়াছিলাম বটে। কিন্তু তাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না। হিম উৎপাদক যন্ত্রের কাঁটা হিমাঙ্কের নিচে দশ মাত্রা রাখা হইয়াছে বলিয়া তাহার যন্ত্রে উৎপাদিত সামান্য উত্তাপের সেই সামর্থ্য ছিল না যে, কক্ষাভ্যন্তরের শৈত্য মাত্রা সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন করিতে পারে। সেই সময় ঘরের কোণের দিক হইতে মাই মাই বলিয়া কাহারো কম্পিত কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিলে, বলিয়া উঠিলাম, কেডায়রে?

আমি হিন্দি। অদৃশ্য হইতে একটি কণ্ঠস্বর খরখর করিয়া উঠিল। তামিল নাড়ুর লোক। নাম থিরুঙ্গা। জাতে হিন্দু।

তোমারে দেখতাছি না! আমার সামনে আস না কেন?
তুমি কি বাঙ্গালি? কী নাম তোমার? জাতপাত কী?

থিরুঙ্গার প্রশ্নের জবাবে বলিলাম, হ! বাংলাদেশী। নাম জামাল!
থিরুঙ্গা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, উটের আরবি জানো? আমি তোমার সামনে না পিছনে সেইটা দেখতে পাইবা না। হাওয়া-বাতাস আমরা দেখতে পাই না। তেমনি মানুষের আত্মা দেখা যায় না। সলিড কিছু হইলে দেখা যাইত।
আমি অবাক হইয়া বলিলাম, বাহ, তুমি তো ভালোই বাংলা বলতে পারতেছো!
বাংলা না। থিরুঙ্গা কহিল, আত্মার ভাষা সবই এক। দেহের ভেতর যখন বাস করে, তখন সেই দেহের প্রভাবে তার ভাষা পরিবর্তন হয়।

বলিলাম, তুমি কয় বছর যাবত এই দেশে আছ? আর কতদিন এই ঠাণ্ডা ঘরে আছ?
ছুটি কাটাইয়া আসছি তিন মাস। এই লাশখানায় আছি বাইশ দিন।

তোমার লাশ ইন্ডিয়া পাঠাইবো না?

জানি না। শুনছি দেশে খবর পাঠাইছে!

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, এতদিন হইয়া গেল এখনো খবর আসে নাই?

আমার গ্রামে রাস্তা-ঘাট বিজলি পোস্টাপিস কিছুই নাই। খবর আইতে যাইতে অনেক সময় লাগে।
আমি বলি, আরে এখনকার দিনে মোবাইল ফোন তো সবখানে আছে।
আমার গ্রামে নাই। থিরুঙ্গার কথা কেমন বিষণ্ন মনে হয়।
তারপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করিতে থাকে। কী কহিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। আমার দেশে খবর পাঠাইয়াছে কিনা, বা আমাকে দেশে পাঠাইবার আবেদন কবে এই দেশে আসিয়া পৌঁছাইবে তাহার সবই আমার অজ্ঞাত। যার মাথা নাই, তাহার মাথা ব্যথাও নাই। আমাদের দেহ নাই বলিয়া আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আহার-নিদ্রারও প্রয়োজন নাই। কেবল শীত বোধটা রহিয়াছে। সেই সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে শ্রান্ত হইবার স্বভাবটা। থিরুঙ্গার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমারও মনে পড়ে, সন্তানদের মধ্য হইতে মা আমাকেই বেশি ভাল বাসিতেন। এখন মায়ের বয়স নব্বই পার হইয়া গিয়াছে। এই বয়সে অত্যধিক প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ পাইলে সেই বেদনা তিনি সহিতে পারিবেন কি না তাহাই ভাবনা হইতেছিল। আরো ভাবনা হইতেছিল, আমার নিজের বা স্ত্রী-সন্তানের জন্য এমন কোনো সম্পদ বর্তমান নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া পিউ এবং ছেলে-মেয়েগুলার ভবিষ্যতের সাফল্য রচিত হইবে। এমনটা হইতে পারে পিউ নিজে কিছু করিতে পারে। কিন্তু সেতো বেশি বিদ্যা অর্জন করে নাই যে, বিদ্যার জোরে সমাজ আর পরিচিত মহলে মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান হইবে। পিতা বা ভাই-ভগিনীর গৃহে আশ্রয় নিবার মতন নারী পিউ নহে। তাহা হইলে কি সে পুনরায় কাহাকেও বিবাহ করিবে? কে এমন হৃদয়বান পুরুষ আছেন যিনি পাঁচটি সন্তানের ভার লইবার মহৎ উদ্দেশ্যে তাহাদের জননীকে বিবাহ করিবেন?

৪

থিরুঙ্গার বাড়ি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তাহার পিতা-মাতা স্ত্রী-সন্তান কেহই মৃত দেহ ফিরিয়া পাইতে চাহেন না। বদলে ক্ষতি-পূরণ বাবদ যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহাই যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মৃত থিরুঙ্গার চাইতে তাহাদের অর্থ প্রয়োজন।

নিজেদের মধ্যে এই ধরনের কথাবার্তা বলিতে বলিতে এক শুক্রবার আটজন লোক হিম ঘরে প্রবেশ করিল। তাহারা প্রথমেই আমার হিমায়িত মৃত দেহটি বাক্স হইতে নামাইয়া একটি তক্তার উপর শোয়াইয়া রাখিল। ঘটনা দেখিয়া আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম এই ভাবিয়া যে, থিরুঙ্গার পরিবার পরিজনের মতন আমার পরিবার-পরিজন এতটা অর্থলোভী নহে। তাহাদের মাঝে খানিকটা হইলেও মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

থিরুঙ্গা কাঁদিতেছিল। হয়তো আমার মৃত দেহের স্থানান্তর দেখিয়া সে অনেকটা ভয় পাইয়াছে। তাহার কান্না শুনিয়া আমার খারাপ লাগিবার কথা থাকিলেও বেশ নির্বিকার থাকিতে পারিয়াছিলাম। আমার দেহটি বাহিরে নিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমিও গমন করিলাম। মসজিদের ভিতরকার একটি কক্ষে আমাকে গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া রাখা হইয়াছিল। খানিক ক্ষণ পর আরেকটি মৃত দেহ কাফন পরানো অবস্থায় আমার দেহের পাশাপাশি রাখা হইল। শুনিতে পাইলাম ফিস ফিস করিয়া থিরুঙ্গা বলিতেছে, জামাল আছ?
বলিলাম, আছি এখানেই।

থিরুঙ্গা বলিল, আমিতো হিন্দু। আমার লাশ মসজিদে কেন?

বলিলাম, এইটা আরব দেশ। এখানে সকল মৃতের জন্যই হয়তো জানাজার ব্যবস্থা আছে। হইতে পারে! কেমন আক্ষেপ ঝরিয়া পড়িতে শুনি থিরুঙ্গার কথায়।

কিছুক্ষণ পর আরো লোকের সমাগম হইলে থিরুঙ্গা কহিল, তোমার লাশ কি দেশে পাঠাইবে না? আমার বলিতে বাসনা জাগিয়াছিল যে, বলি, তোমার মতন এমন অর্থ-পিশাচ না আমার পরিবারের লোকজন। কিন্তু নীরবতাকেই উত্তম জ্ঞান করিয়া চুপ হইয়া রহিলাম।
জানাজা পড়াইবার আগে একজন পুলিশের লোক দুইটি কাগজ হইতে আরবিতে কি কি পড়িয়া শুনাইল যাহা আমার বোধগম্য হইল না।

পাশেই আরো দুইজন বলাবলি করিতেছিল যে, প্রত্যেকটি মৃতদেহের পরিবারকে পঁচিশ হাজার রিয়াল করিয়া পাঠানো হইয়াছে। তাহাদের আলাপচারীতা শুনিয়া আমার পুনরায় হাসি পাইতেছিল।
জানাজা হইয়া গেলে আমাদের মৃত দেহ দুইটি একটি পিক আপ ভ্যানে তুলিয়া স্থানীয় বেওয়ারিশ লাশ দাফনের গোরস্থানে নিয়া গেলে আমার দেশে ফিরিবার, স্ত্রী-সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোনকে দেখিবার বাসনা মুহূর্তকালের মধ্যেই বাষ্পের মত উবিয়া গেল। তৎসঙ্গে তাহাদের প্রতি এত কাল কিংবা ক্ষণ কাল পূর্বেও যেই সু-উচ্চ ধারণা মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম তাহাও তিরোহিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না।

আমাদের মৃতদেহ দুইটি কবরস্থ করিয়া বলদিয়া বা পৌরসভার লোকজন চলিয়া গেলে থিরুঙ্গা বলিয়া উঠিল, হায়, জগতে কেউ কারো না! যাগো সুখের লাইগা সব কিছু ছাইড়া এই বিদেশের মাটিতে থাকন-খাওনের কষ্ট করলাম, বেশি কামাইর আশায় একটু আরামের কথা ভাবলাম না, হেই তারাই, যারা আমার আপন আছিল, আইজগা আমার লাশটারেও বেইচ্যা দিল। হায়রে ট্যাকা। হায়রে ক্ষুধা!
আমি আর কী বলিতে পারি। থিরুঙ্গা কে আর আমিই বা কে? আমাদের স্বজনদের পেটের ক্ষুধা যদি আমাদের রক্ত-মাংস আর প্রাণের মূল্যে মিটিয়া যায় তাও বোধ করি ভাল। কিন্তু আদৌ তাহাদের ক্ষুধা কি যাবজ্জীবন কালে মিটিবে?

২৫-৫-২০১১
সৌদি আরব।

ছোট গল্প

আজ আমি একা একা

শৈলার মামুন ম. আজিজ

“.... মজুর। নুহুল মারা যাবে কি যাবে না, সে কথা আমি কি করি বলি? না বলব, সবাই হয়তো তাই বলে। সেটা কি প্রকৃতির উপর খবরদারী করা হয়ে যাবে না? মারা তো যেতেও পারে......”

ছোট গল্প

১.
আমি কি মরে যাচ্ছি?
নুহুলের এ প্রশ্ন আমাকে বিচলিত করে কি করে না তার চেয়ে বড় কথা আমি ভাবছি আসলে এমন প্রশ্নে কি উত্তর দেয়ার আছে। শুধুমাত্র হ্যাঁ কিংবা না দিয়ে এর উত্তর হয় না। দুকথা জুড়ে দিয়ে উত্তরটাকে দীর্ঘ করে আবেগ ঘন বানিয়ে কিংবা কিছু ব্যাখ্যা যোগে ডালপালা গজিয়েও কোনো উত্তর আদৌ দাঁড় করানো যায় না। যার প্রশ্ন সেও তা জানে। এ প্রশ্ন তার উত্তরের আশায় নয়। এ প্রশ্ন প্রকারান্তরের। এ চিরন্তন অকারণ।

সামনের মানুষটি মরে যাচ্ছে কিনা এমন বলার ক্ষমতা মানুষকে প্রকৃতি দেয়নি। বলার কেন, বোঝার ক্ষমতাও কি আদৌ দিয়েছে প্রকৃতি?

আমি প্রকৃতির একনিষ্ঠ ভোগ মজুর। নুহুল মারা যাবে কি যাবে না, সে কথা আমি কি করি বলি? না বলব, সবাই হয়তো তাই বলে। সেটা কি প্রকৃতির উপর খবরদারী করা হয়ে যাবে না? মারা তো যেতেও পারে। এই তো কালকের এক খবরের কাগজে পড়লাম- ছোট এক তার কাটায় গুঁতো খেয়ে এক মহিলা রাস্তার ধারে হঠাৎ ঢলে পড়েছে, তারপর তুলেছে পটল মানে ঐ মরে গেছে। খবরটা নিছক চমক সৃষ্টি করলেও ঘটনা তো সত্যি। ছবি ছিল। পত্রিকাটার একটা সুনাম আছে। হয়তো তার্কিকরা বলবে সেতো অনেক পত্রিকারই থাকে। মদ্দ কথা মৃত্যু এক আজব ঘটনা যার কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ রঙ নেই। তর্কে ভরা দুনিয়ার আমি জানি এও সবাই মানবে না। নিজের বিশ্বাসেই একই মানুষ অবিশ্বাসের গরল ঢেলে দেয় কেবল মাত্র সময়ের পরিবর্তনে।

নুহুলকে বলেই ফেলব নাকি, না রে নুহুল , এ সামান্য বেদনা। এ কষ্ট দেবে। এ ভীষণ ভোগাবে। মারবে না।

মামুন ম. আজিজ

নিজের সম্পর্কেঃ সুন্দরবনের কাছাকাছি সাতক্ষীরার এক গ্রামে আমার জন্ম। শৈশবটা পুরোটাই অবশ্য ঢাকা শহরে কেটেছে। পেশায় আমি প্রকৌশলী। কিন্তু লেখালেখি আমার প্রাণ। গোটা পাঁচেক বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে গর্ববোধ জাগে না। কারন আমি জানি সাহিত্য সাগরের এক বিন্দু জলও আমার এখনও গ্রহণ করা হয় নি। তাই সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশিত আছি। থাকার ইচ্ছে অনন্তকাল। হয়তো একদিন মনের মত কিছু রচনা করতে পারব।

ভালো লাগেঃ ঘুরতে, নেটে বসে থাকতে আর লিখতে।

প্রিয় ব্যক্তিত্বঃ বিষয় বিচারে নানাজন, তাই আলাদা করে উল্লেখ করি না।

শৈলী সম্পর্কেঃ দেশের প্রথম পরিপূর্ণ সাহিত্য ব্লগ। আশা করি সাহিত্য জগতে এই ব্লগের শৈলীরা একদিন সু সাহিত্যের সুস্পষ্ট ছাপ রাখবে।

ছোট গল্প

আসলেই হয়তো সে এখন মরবে না। এখানে কোনো ভবিষ্যত বাণী নেই। অভিজ্ঞতা। খুব সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা। নুহুল নিজেও তা না জানার নয়।

কিন্তু সামনের মানুষটি মারা যাবে কি যাবে না এ সত্যও কিন্তু মানুষ জানে। আমি না জানলে কি হবে, আমার চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষও জানে। একজন খুনি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ এ ধারনা করায় আমার ভ্রান্তি না হবারই কথা। সেই খুনি যখন খুন করে - গলায় বিশাল লম্বা ছুরি দিয়ে পোঁচ দিতে দিতেই বুঝে যায় দেহটা নিথর হয়ে গেছে সামনের জনের। ঘটনা চক্রে দু একজন খুনির হাত থেকেও বেঁচে মৃত্যুর দুয়ারে কড়া নেড়ে ফিরে আসে কেউ কেউ। সেটা ব্যতিক্রম।

এই এখন আমি যেমন জানি নুহুলের হয়েছে বদ হজম। তিন রাস্তার মোড়ের নাড়িভুঁড়ি ভাজিতে আমার সামনেই খেলো কাল। সকাল থেকে পায়খানা। তারপর এখন তীব্র ব্যথা। প্রথমে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করলেও পরে ব্যথার মুভমেন্ট খুব কম এবং পায়খানা নামের ছোট্ট খুপরিটির প্রতি অমোঘ গমনের আধিক্য দেখে বোঝা যাচ্ছে আসলে কি ঘটেছে উদরে।

শারীরিক একটু আধটু ব্যতিক্রম যন্ত্রণাতেই ওর চিৎকার চ্যাঁচাম্যাঁচি শুরু হয়। থার্মোমিটারে ১০০ দাগের উপরে পারদ উঠলেই ওর সেকি হাউমাউ কাউ কাউ। বুঝতে পারছি পেটে ব্যথা প্রচণ্ড। তাই বলে সে ব্যথায় মানুষ মারা যাবার রেকর্ড খুবই কম।

আমি জানি নুহুল এখন মরবে না। তারপরও মরে গেলে সেট বেশ ব্যতিক্রম।

আমাদের পাড়ায় কানা আবদেল নামে এক খুনি ছিল। সে ব্যাটাকে একবার ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপালো এলাকার অন্য এক ছোট খুনে দল । আবদেলেরই এক কালের শিষ্য তারা। তাড়াহুড়া করে তারা সে মরে গেছে মনে করে রক্তাক্ত প্রান্তরে আপাত নিহত আবদেলকে রেখে চলে গেলো। কিন্তু সে আরও একবছর বেঁচে ছিল। ওটাও ব্যতিক্রম। বেচারা পরে শুনেছি ডেঙ্গু জ্বরে মরে গিয়েছিল। যাক আর দ্বিতীয় কোনো কোপাকোপিতে তাকে পড়তে হয়নি।

ছোট গল্প

আসলেই হয়তো সে এখন মরবে না। এখানে কোনো ভবিষ্যত বাণী নেই। অভিজ্ঞতা। খুব সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা। নুহুল নিজেও তা না জানার নয়।

কিন্তু সামনের মানুষটি মারা যাবে কি যাবে না এ সত্যও কিন্তু মানুষ জানে। আমি না জানলে কি হবে, আমার চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষও জানে। একজন খুনি আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ এ ধারনা করায় আমার ভ্রান্তি না হবারই কথা। সেই খুনি যখন খুন করে - গলায় বিশাল লম্বা ছুরি দিয়ে পোঁচ দিতে দিতেই বুঝে যায় দেহটা নিথর হয়ে গেছে সামনের জনের। ঘটনা চক্রে দু একজন খুনির হাত থেকেও বেঁচে মৃত্যুর দুয়ারে কড়া নেড়ে ফিরে আসে কেউ কেউ। সেটা ব্যতিক্রম।

এই এখন আমি যেমন জানি নুহুলের হয়েছে বদ হজম। তিন রাস্তার মোড়ের নাড়িভুঁড়ি ভাজিতে আমার সামনেই খেলো কাল। সকাল থেকে পায়খানা। তারপর এখন তীব্র ব্যথা। প্রথমে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা মনে করলেও পরে ব্যথার মুভমেন্ট খুব কম এবং পায়খানা নামের ছোট্ট খুপরিটির প্রতি অমোঘ গমনের আধিক্য দেখে বোঝা যাচ্ছে আসলে কি ঘটেছে উদরে।

শারীরিক একটু আধটু ব্যতিক্রম যন্ত্রণাতেই ওর চিৎকার চ্যাঁচাম্যাঁচি শুরু হয়। থার্মোমিটারে ১০০ দাগের উপরে পারদ উঠলেই ওর সেকি হাউমাউ কাউ কাউ। বুঝতে পারছি পেটে ব্যথা প্রচণ্ড। তাই বলে সে ব্যথায় মানুষ মারা যাবার রেকর্ড খুবই কম।

আমি জানি নুহুল এখন মরবে না। তারপরও মরে গেলে সেট বেশ ব্যতিক্রম।

আমাদের পাড়ায় কানা আবদেল নামে এক খুনি ছিল। সে ব্যাটাকে একবার ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপালো এলাকার অন্য এক ছোট খুনে দল । আবদেলেরই এক কালের শিষ্য তারা। তাড়াহুড়া করে তারা সে মরে গেছে মনে করে রক্তাক্ত প্রান্তরে আপাত নিহত আবদেলকে রেখে চলে গেলো। কিন্তু সে আরও একবছর বেঁচে ছিল। ওটাও ব্যতিক্রম। বেচারা পরে শুনেছি ডেঙ্গু জ্বরে মরে গিয়েছিল। যাক আর দ্বিতীয় কোনো কোপাকোপিতে তাকে পড়তে হয়নি।

আমার নিজের মতেই নিজে এখন কাচি চালাচ্ছি। সামনের মানুষ মারা যাবে কি যাবে না তা জানাও যায় আবার যায় ও না। দুটোই সত্য। দুটোরই ব্যতিক্রম আছে। দুটোরই আছে সত্যতা।

(২)

আমার এই অবিমৃশ্য ভাবনায় ছেদ পড়ল। নুহুলের চিৎকার বেড়েই চলেছে। বিরক্তও লাগছে হঠাৎ। হালারপুত হাগা আর কারও হয় না নাকি, নাকি খালি তোরই একার হইছে কেবল জীবনে। অসুস্থ দেখে এই অশ্লীল গালি সম্বলিত কথাটা সহ নিবাসী বন্ধু প্রতিম নুহুলকে না বলে অন্তরের ভেতরেই ফাটিয়ে দিলাম। তারপর সেই বোমা ফাটা ধ্বনি বেরিয়ে এলো একটা ইসস শব্দ হয়ে।

বেচারা আমাকে ডাকছে। মিহি চিৎকার, সুরেলা আহ্বান, রূপম, ভাই আমার কিছু একটা কর

আমি, রূপম সে ডাকে সাড়া দিলাম। বেচারা সকাল থেকে কম করে হলেও পাঁচ থেকে ছয়বার পুরীষ ত্যাগ করেছে। তার ভাষ্যমতে জলীয় মল। চেহারাই বলে দিচ্ছে। ফর্সা বদনে কালো চোখের নিচে আরেকটু বেশী কালো দাগ । ভয় পেতে শুরু করেছি আমিও। কাল পয়লা বৈশাখ। এ বাসায় আমরা দুটি ব্যাচেলার প্রাণী ছাড়া আও তিনজন প্রাণী বসবাস করেন। তারাও সবাই ব্যাচেলার গোত্র এখনও ত্যাগ করেননি। যদিও দুজন শীঘ্রই ত্যাগ করার পায়তারা করছেন। আমরা বাকী তিনজন তারা চলে গেলে বাড়ী ভাড়ার অংশীদারিত্বে বাড়তি টাকার যোগান নিয়ে যতটা না ভাবছি তার চেয়ে বেশী ভাবছি বিয়ের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা নিয়ে। কারণ সে দুজনেই বড়লোক শ্বশুর দেখে প্রেমিকা জুটিয়েছেন। ভালো পোশাক পরিধান আর উপহার প্রদানের বাধ্যবাধকতা আমাদের চিন্তিত করে তুলছে। আমাদের বাজেটে বাড়তি অর্থ যোগ করাটা খুবই মুশকিল।

তার চেয়ে বেশী ভাবছি বিয়ের দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা নিয়ে। কারণ সে দুজনেই বড়লোক শ্বশুর দেখে প্রেমিকা জুটিয়েছেন। ভালো পোশাক পরিধান আর উপহার প্রদানের বাধ্যবাধকতা আমাদের চিন্তিত করে তুলছে। আমাদের বাজেটে বাড়তি
অর্থ যোগ করাটা খুবই মুশকিল।

বিয়ে জনিত ফাঁদে পা দিতে যাওয়া দুজনের থেকে আমরা বাকী তিনজনই অনেক স্বল্প আয় করে থাকি। নতুন অংশীদার বাড়িতে পাওয়া যাবে। কয়েকজন লাইনে আছে। কিন্তু সবচেয়ে মালদার পার্টি দুজন চলে যাবে। বিয়েটাই যত কাল। আমাদের

এমন কত মাস গেছে । দেখা গেছে ঐ দুজনেই বাড়তি কোনো খরচ হলে, কোনো মেহমান এলে

কোনো বিয়ের দাওয়াতে যেতে হলে বাড়তি অর্থের সিকি ভাগ যোগান দিয়েছেন। তারা আমাদের বড় ভাইয়ের মত। আসলে তাদেরই অমন ধনীর দুলালীর সাথে প্রেম করা মানায়। তাদেরই জন্য বিবাহ। আর আমাদের বাকী তিনজনের জন্য নারী পরম পরিহার্য। যদিও ঘটনা যা ঘটেছে কয়েকবার তা ঠিক বিপরীত। নারীর কাছেই আমি বাদে বাকী দুজন হয়েছে পরিত্যাজ্য। আর আমার তো কপালই ফাটা।

আমরা তিনজন বড় অসহায় না হলেও তাই ঐ দুজন যারা বিয়ে করবে শীঘ্রই সম্ভবত আগামী মাসে তাদের কাছ থেকে আমরা অসহায়ত্ব উপহার হিসেবে পেতে চাচ্ছি।

আমাদের সতীর্থ তৃতীয় অসহায় পুরুষ এবং বাকী সেই সহায় দুজন কেউ আজ নেই। ছুটি পেয়েই বাড়ী ভেগেছে। আরে সহায় দুজন তো আনন্দে আছে। আনন্দ ভাগাভাগি করতে গেছে বাড়ীতে। আর বাকী জন। ঐ হান্নান । ও ব্যাটার চলেই টিউশনি করে। আমার আর নুহুলের চেয়েও তার অবস্থা শোচনীয়। তুই বাড়ি যাবি কেন এত। বাড়ীতে কি তোর নাগর আছে। সেও ছিল শুনেছি। তার কোলে এখন বাচ্চা । একটা না দু দুটো। পাশের গ্রামে বিয়ে হয়েছে সে ললনার। ওত বড় ছ্যাকার পড়েও তার লজ্জা নেই। গত পয়লা বৈশাখে এক নারীর সাথে বেচারা খাতির করেই ফেলল। বড় ভাই, সহায় দুজনের অশনি সংকেত মানলো না। আরে গুরুর কথা মানলি না। পরে দেখলি তো। এক মাসেই তোর কি হাল। টিউশনির টাকাটা একেবারে কম কামাতো না। ১৫ দিনেই সে মেয়ের পিছনে খরচ করে ফেলল। তারপর আমাদের কাছে পাতল হাত। শিক্ষা কি তবু হয়েছে। সেবার বাড়ি থেকে ফেরার পর শুনলাম পরকীয়ার ভুতে ধরেছে। ভুতের যোগালি সেই সে পুরানো প্রেমিক। শালা ঢেঁকি বলে স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে আর প্রেমিক দুই বাচ্চার মার সাথেও করে প্রেম।

যাক আমি আর নুহুল নারীর পাল্লায় পড়বার নই।

কিন্তু এখন আমি একা কি করে সামলাই নুহলকে? যদি ডায়েরিয়া হয়ে থাকে। ডায়রিয়ায় শুনেছি মানুষ মারা যাবার হার একেবারে কম নয়। কিংবা আরেক ধাপ

পেরিয়ে কলেরা।

কাল ছুটি। এখন সন্ধ্যা ঐ ধেয়ে আসছে বলে। কলেরা হাসপাতালটা সম্ভবত মহাখালীতে। অত দূর নিয়েও যাব কি করে। মাসের এখন মধ্যকাল। গোনা টাকা। নুহলেরও এবং আমরাও তাই। নানান চিন্তায় আমি জর্জরিত হয়ে বুঝে উঠতে পারছি না কি করি। এদিকে নুহুল তো এখন ননস্টপ চিৎকারে মেতেছে ভীষণ।

যে করেই হোক বেচারার পাতলা পায়খানা বন্ধ করতে হবে। একটু শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করে ডিসপেনসারির উদ্দেশ্যে বের হলাম। মেইন দরজায় লাগালাম একটা তালা।

তারপর ভাবলাম কি ভয়াবহ একটা কাজ করলাম এই মাত্র। যদি পথে আমি মরে যাই। মরেও তখন এক খুনের জন্য দায়ী হয়ে রব। স সিনেমার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। শালার ঐ সিনেমার ৫ম পর্বে দেখলাম খুনিটাও মরে গেছে। কিন্তু মরার আগেও মানুষ মারার এমন এমন ফাঁদ পেতে গেছে মরতেই হলো অনেক কে। ভীষণ নৃশংস এক সিরিজ। দেখলে বমি আসে। যদি সত্যি আমি আর ফিরে না আসতে পারি। আমার স্মৃতি বিভ্রম ঘটে। কি হবে নুহুলের? সেতো তালা বন্দী। বাকীরা ফিরবে সেই শনিবার কিংবা রবিবার। এর মধ্যে বেচারা ? না , এত ভাবার কি আছে। বেচারা তো অচল হ য়ে পড়েনি। কিন্তু ওর মোবাইলে টাকা আছে বলে আমার মনে হয় না। তিন দিন আগে এক মেয়ের পাল্লায় পড়েই গেলো। রং নম্বর এ কল এলো। পাক্কা দু ঘণ্টা কথা বলেই গেলো। আমি পারি না শালার কথার জ্বালায় ঘুমাতে। বললাম, কোনো লাভ নেই। যোগাযোগ রাখতে হলে অমন কথা কিন্তু নিয়মিত বলেই যেতে হবে। শুনলো না। সারা মাসের মোবাইল খরচ একদিনেই শেষ তার। এখন বিপদের সময় বুঝবা মজা!

ডিসপেনসারির ছেলেটা আমাকে ভালোই চেনে। নুহুলের কথা বলতেই তড়িৎ দুটো মোটা মোটা ট্যাবলেট আর চার প্যাকেট স্যালাইন দিলো। বলল, ট্যাবলেট দুটো রাতে আর সকালে খাওয়ালে সব শক্ত হইয়া যাইব।
আমি মনে মনে ভাবি, পেশাবও শক্ত হয়ে যাবে নাকি রে?

যাক, ওষুধে কাজ হলে বাঁচি। এই শহরে আমার বন্ধু বলতে আসলে ঐ নুহুলই। কতকাল হয়ে গেলো একই ঘরে আমাদের দুটি প্রাণের বাস।

গত পাঁচ বছরে কত চাকুরী বদলেছি কিন্তু গৃহ সঙ্গী বদলাইনি। ঐ তো আমার সফর সঙ্গী এ ইট সুরকির ঘন জঙ্গলে। কাল পহেলা বৈশাখে নুহুল ছাড়া একা একা কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে বের হব?

ওষুধের দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটছি। একটা রিকশা এসে গুঁতো দিয়ে গেলো। সাথে দিয়ে গেলো রিকশাওয়ালা দুটো গালিও। বুঝলাম না গালিটা বোনাস না গুঁতোটা। জ্বালা করছে , কেটেছে নাকি। একটু যে একপাশে সরে লুঙ্গিটা উঁচু করে দেখব সেরকম কোনো পাশই ফাঁকা নেই। যাক কাটলে কেটেছে।

(৩)
স্যার, লইয়া যান। পেটের সব ব্যারাম ভালো হইয়া যাইবো। এক্কারে গাছ পাকা বেল।

পেটের অসুখ কথাটা আমার দৃষ্টিকে ওদিকে ফেরাল। একটা ছোট ছেলে। বয়স খুব বেশী হলে বারো। কাছে গেলাম। একটা বেল হাতে উঠলাম। মনে পড়ল গ্রামে আমাদের বাড়ীর চত্বরেই একটা বড় বেল গাছ আছে। মা ছোট্টবেলা গাছ থেকে পাকা বেল পাড়ত লগি দিয়ে। সে এক কৌশল বটে। এক টানেই একটা বেল নেমে যেত নিচে। সেই বেল দিয়ে চিনি মিশিয়ে শরবত বানাতো মা। ইস্ মায়ের সে হাতের অমৃত। কতদিন হলো দেশে যাই না।

যাক ভালোই হলো। নুহুলের জন্য একটা বেল নিয়ে যাই।
এই বেল কত করে রে?

স্যার , এই ঝুরির টা ২৫ টাকা আর ঐটারটা ৪০ টাকা।

দেখতে তো কাছাকাছিই।

স্যার চান সুরুজ দুইটাই তো গোল, দুইটাই কি সমান রোদ দেয়?

অবাক হলাম, এতটুকু পিচ্চি কি কথার তেজ। নিশ্চয় পিচ্চিটা লেখাপড়াও করে না।

আই তুই লেখাপড়া করছ না?

স্যারে যে কি কয়, আমি পড়লি এই ব্যবসা ক্যাডায় করবো? স্যার হেই কথা বাদ দেন, এই ৪০ টাকার টা লন, আমার বেল একবার খাইলে আবার আইবেন। আমি ভালা বেলই বেচি।

না, এইটা ৩০ টাকা দেই, দাও।

না, স্যার আপনার লাইগ্যা পাঁচ টাকা কম, লন, ঠকবেন না

ঠকলাম কি না জানি না। তবে আমি কিনেই ফেললাম। মনে হলো নুহুলের এটা খাবার দরকার। কিন্তু চিনি কি আছে ? কি জানি। থাকার কি কথা। চিনি কোন কাজে লাগে। চা তো আমরা বাইরেই খাই। বুয়াটাও আজ আসলো না। কি মুসিবত। বেলের শরবত তো আমি কোনোদিন বানাই নি। মা বানানোর সময় যদি একদিন দেখে রাখতাম। মাকে কি একবার ফোন করে জিজ্ঞেস করব? দূর খালি বিয়া শাদিও কথা শুরু করবে। না করাই ভালো।

গলির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে আরেকবার ভাবলাম। চিনি কি নিয়ে নিব। মন মানলো না। আসলে চিনির যে দাম কিনতে সাহসে কুলাচ্ছে না। কেমন যেন দিনে দিনে কিপটে হয়ে উঠছি আমরা।

গলির ভেতর সামান্য পরিসরে দুটো ছেলে ক্রিকেট খেলছে। ঠিক বেল বিক্রেতা ছেলেটার বয়সী। এক পাশে তিনটে উইকেট গেড়েছে আর অন্য পাশে একটা। মাঝে ২২ গজ দূরত্ব তো আর না মাত্র বড় জোড় দশ গজ। অপার সম্ভাবনা যে ক্রিকেটে আমাদের দেশের এ যেন তারই সূচনাগার। দুটো ভদ্র ঘরের সন্তান। সুন্দর পোশাক গায়ে। চেহারায় লাবণ্য। মাখন মাংস খাওয়া ত্বকে দ্যুতি। নিশ্চয় স্কুলে পড়ে। দামী কোনো স্কুলে। যত দামী স্কুল আজকাল নাকি তত ভালো লেখাপড়া। শালার কপালে জুটেছে গ্রামের চাল হীন মাটির দেয়ালের স্কুল। আমারা চাকুরী পাব কি ফাও।

একটা ছেলে বল করল আমি যেদিক থেকে ফিরছি সেদিক থেকে। অন্যপাশের ছেলেটা বলটা একটু ব্যাটে লাগিয়েই দিলো দৌড়। বলার ছেলেটা দৌড়ে বল কুড়িয়ে যেদিক থেকে ব্যাটস ম্যান ছুটে এলো সেদিকে স্ট্যাম্পে লাগানোর জন্য দৌড়ে গিয়ে হাতে হাতে ছুঁয়ে দিল স্ট্যাম্প। আমি দেখছি । প্রত্যক্ষ সাক্ষী। বলার একবারও পেছনে তাকায় নি। বলটা স্ট্যাম্পে ছোঁয়ানোর পরই সে তাকাল। ওদিকে ব্যাটস ম্যানও ক্রিস পার করেছে। সেও পিছনে তাকায় নি। আমি স্পষ্ট দেখলাম।

তারপর ঝগড়া। কি আশ্চর্য বলার বলছে, খোদার কসম, আমি দেখেছি তুই পৌছাস নাই। ব্যাটসম্যান ও বলল, আমি দেখেছি আমি পৌঁছানোর পর তুই বল লাগিয়েছিস।

আমি পাশ কেটে এগিয়ে যাই। আমি অবাক হই। ওদিকে অশিক্ষিত বেল বিক্রেতাও কথা বলেছে আর কথা বলছে এই দুই সুশিক্ষিত আদুরে কপালে ছেলে। একজন তো কসমও নিয়ে নিলো। এই কি উন্নত শিক্ষা। এ কারণকেই কি মন্ত্রী আর নেতারা এত এত কসম কেটেও মিথ্যে বলে নির্দ্বিধায়?

(পরিশিষ্ট)

স্যালাইন আর ওষুধের ফল রাতেই পেলাম। পায়খানার সাথে যে সম্পর্ক নিবির হচ্ছিল নুহুলের সেটা শূন্যের কোটায় এসে গেলো রাত দশটার আগেই। স্যালাইন তিনবার খাইয়ে দিলাম। বেলের শরবত বানানোর সাহস আমার হলো না। যদিও চিনি ঠিকই পেলাম রান্নাঘরে। ওটা বুয়ার জন্য রেখে দিলাম। সেই বানাক। সকালে এলে হয়। নাও আসতে পারে। কাল যদি আমার বৈশাখী উৎসবে যাবার শখ হয় তারও। হবার কথা না। আবার ঐতিহ্য বলে কথা। ঐতিহ্য কি ধনী গরিব মানে? কখনও কখনও মানে বোধহয়। না হলে পান্তা ভাতের রসিকতা বিষয়টা বৈশাখী উৎসবে যুক্ত হতো না।

সারারাত নুহুল আর জ্বালায়নি। যদিও সে ঘুমাবার পরে তার মোবাইলটা বেজেছে দু দুবার। আমি একবারও ধরিনি। এ বদ-অভ্যাস টা আমার নেই। তবে দ্বিতীয়বার নামটা দেখলাম। সেও দেখলাম এ ভেবে যে অতি গুরুত্বপূর্ণ কেউ হলে সদ্য পাতলা পায়খানা মুক্ত নুহুলকে ডেকে দিতাম। নাম ওঠেনি। মনে হলো গুরুত্বপূর্ণ কেউ না, সেই মেয়েটা হয়তো। যে তার এক মাসের মোবাইল বিল গিলে খেয়েছে এক রাতেই।
হয়তো ভালোই হতে পারত যদি নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে পারত। আমার এ অকৃত্রিম বন্ধুটার নারী বিচ্যুতি মাঝে ছেদ চিহ্ন পড়ত। হয়তো কপাল খুলেও যেতে পারত। কিন্তু যোগাযোগ রক্ষা করার ক্ষমতা কি আর আমাদের আছে। আমরা তো ব্যস্ত জীবনকে টিকিয়ে রাখতেই। জীবনে শৈলীর সন্ধান আমাদের জন্য কি?

বেচারা নুহুলের চিৎকারে ভোরে ঘুম ভাঙল। গলায় ভালোই জোড় বেড়েছে। এক ডাকেই আমার মত কুম্ভকর্ণের ঘুমও ভেঙে গেলো। চমৎকার ওষুধের গুন। দোকানদার ছেলেটাকে একটা জবরদস্ত ধন্যবাদ দিতে হবে। তার চেয়ে গুরুত্বপুর্ণ ওষুধটার নাম লিখে রাখতে হবে ডায়েরীর পাতায়।

চোখ ডলতে ডলতে বললাম, কিরে শক্তি ফিরে পেয়েছিস? যাবি নাকি বটমূলে?

কোন উত্তর নেই। আমার দিকে বরং ক্ষিপ্ত দৃষ্টি তার। কারণ বুঝলাম না।
কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিয়ে দিল। বলল, ফোন এসেছিল তখন তুই জেগে ছিলি?
হ্যাঁ ছিলাম, তা ডাকিসনি কেন?
তোর শরীর খারাপ...
দূর শরীর খারাপ, শান্তি কি ভাবল কি জানি?
শান্তি!, ঐ মেয়েটার নাম নাকি?

হুম, কি জেলাস ফিল করছিস।

এবার রাগ হলো, শালা অকৃতজ্ঞ একটা। মোবাইলটা আমার বালিশের পাশ থেকে নিয়ে বাড়িয়ে দিলাম।
নে কথা বল। রাগ ভাঙ্গা। সমাধান কর।

হুঁ, তোর জন্য এখনও বসে আছে

কথাটা বললেও সে ফোনটা ঠিকই নিলো। তারপর বারান্দায় গিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলল বেশ কয়েকটা মিনিট। গেলো আমার সপ্তাহ খানেকের মোবাইল খরচ। যাক তবুও বন্ধুর রাগ ভাঙলে হয়। উঠ বাথরুমের দিকে এগোলাম। বন্ধু সুস্থ হয়েছে। রমনার দিকে যাওয়া যাবে । বৈশাখীর প্রভাতের হিমেল হাওয়ায় সুনিবিড় ছায়ায় শ্যামল চত্বরে গান শোনার মজাই আলাদা। মনটা জুড়িয়ে যায়। তারপর সারা বেলা রোদের সাথে লুকোচুরি। হাজার মানুষের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ার পালা।

আমিও বাথরুম থেকে বের হলাম নুহুল ঢুকলো ঘরে।

বলল,থ্যাঙ্কু দোস্ত মোবাইলটা দেয়ার জন্য। শান্তি মেনেছে। তোকে একটা বাড়তি ধন্যবাদ দিয়েছে আমার সেবা করা জন্য। বারবার করে বলে দিয়েছে তোকে বলার জন্য। তোর জন্য একটা উপহার ও দেবে সে বলেছে আজ।

আমি ভাবছি এ কথার মানে কি?

নুহুল আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই আবার বলে, শান্তি আসবে টিসএসসিতে , ঠিক দশটায়। বল তো কোন ড্রেসে যাব?

আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারছি না। আমি নুহুলের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেই। কিছু বলি না। আমি গামছাটা নিয়ে মুখটা মুছতে থাকি।

নুহুল বলে যেতে থাকে, সাদা পাঞ্জাবি তো ঐ পুরাতন একটাই রে আমার, ওটা পড়ব নাকি তোর ঐ লাল পাঞ্জাবিটা...

আমি পাঞ্জাবিটা এগিয়ে দেই। ভেবেছিলাম ওটা পড়েই আজকে গান শুনতে যাব বটমূলে। আমার এক ছাত্রী আমাকে দিয়েছিল গতবছর। শেষ দিন ছিল পড়ানোর। পাঞ্জাবির সাথে আরও ছিল। সেটা ছিল পকেটে। একটা প্রেম পত্র। একটু রহস্য করে লেখা। আমি অর্থ বুঝতে চাইনি। আমি চেয়েছি ওর গ্রুতে আরও দু একটা টিউশনি পেতে। ভালবাসার মত যোগ্যতা সে ছাত্রীটির চেয়ে আর কেউ বেশী নিয়ে আসবে বলে আমি ভাবি না। কিন্তু নিরুত্তর থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। ও পাড়ায় আমাকে আরও দুটো টিউশনি করতে হতো সে সময়।

যাক সেই পাঞ্জাবিটা আজ কাজে লাগবে আমার বন্ধুর। আমি খুশি হতে শুরু করছি হয়তো।
আমি বলে উঠি, তুই কি এখনই বের হবি?

না,একটু ফ্রেশ হয়ে শেভ করে বের হব।

আমি তালাটা তার দিকে এগিয়ে দেই। তালাটা মেরে দিস বলেই আমি প্যান্ট পড়ে আর একটা টি শার্ট গায়ে চড়িয়ে দরজার বাহিরে বের হই।

ভেতর থেকে নুহুল বলে ওঠে, দোস্ত, করিমের দোকান খুললে, দশটাকা ফ্লেক্সি করে দিতে বলিস আমার নামে, আর দুপুরে ফোন দিস এক সাথে ফিরব।

করিমের দোকানে দশটাকা নগদ দিয়েই নুহুলের মোবাইলে টাকা ভরে আমি হাঁটতে থাকি। আজ আমি হাঁটতে হাঁটতেই রমনায় যাব।

আজ আমি এ জীবনে একা একা প্রথম বৈশাখী প্রভাতে বের হয়েছি। আজ আমি কোনো বন্ধুর প্রয়োজনকে অপ্রয়োজন মনে করছি। আজ আমার খুব মনে পড়ছে আমার সেই ছাত্রীটির কথা।

শৈলী................

আড্ডা হোক শুদ্ধতায়, শিল্প আর সাহিত্যে

-শেষ পাতা

আলো যে
যায় রে দেখা--
হৃদয়ের পুব-গগনে
সোনার রেখা।
এবারে ঘুচল কি ভয়।
এবারে হবে কি জয়।
আকাশে হল কি ক্ষয়
কালির লেখা।
কারে ওই
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায় একা?
ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে--
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা।

(গীতালি)
--রবীঠাকুর

"একটি সুন্দর সাহিত্য আকাশের প্রত্যাশায়"

............আমরা আমাদের মত থাকতে চাই। শুভাশিষ।

-**শৈলী টিম**

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন –
মানবেরা, ওই স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে ।

--রবীঠাকুর

-- একটি শৈলী প্রকাশনা --